সরকারের অঙ্গসমূহ (Organs of Government)

ইউনিট ৯

সরকার রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক নামে পরিচিত। সরকারের সাধারণত আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ নামে তিনটি বিভাগ থাকে। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ আইনকে প্রয়োগ করে এবং বিচার বিভাগ বিচারিক কার্য সম্পাদন করে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগের কর্ম-দক্ষতার উপর সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। এই ইউনিটে সরকারের এই তিনটি বিষয়ে কার্যাবলীসহ নানাবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ-৯.১ ঃ সরকারের অঙ্গ	পাঠ-৯.৯ঃ বিচার বিভাগের গঠন ও কার্যাবলি
পাঠ-৯.২ ঃ আইনসভার ধারণা ও কার্যাবলি	পাঠ-৯.১০ঃ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা
পাঠ-৯.৩ ঃ এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা	পাঠ-৯.১১ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
পাঠ-৯.৪ ঃ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা	পাঠ-৯.১২ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি
পাঠ-৯.৫ ঃ গণতন্ত্রে আইন সভার ভূমিকা	পাঠ-৯.১৩ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ-৯.৬ঃ আইন সভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ	পাঠ-৯.১৪ঃ ক্ষমতা ভারসাম্য নীতি
পাঠ-৯.৭ঃ শাসন বিভাগের গঠন ও কার্যাবলি	পাঠ-৯.১৫ঃ বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ
পাঠ-৯.৮ঃ শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি	

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৯.১ সরকারের অঙ্গ (Organs of Government)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সরকারের অঙ্গসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সরকার, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইনের শাসন, সার্বভৌম।

সরকারের অঙ্গসমূহ

রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রকে বাস্তবে দেখা যায় না। রাষ্ট্রকে উপলব্ধি করা যায় এর অন্যতম উপাদান সরকারের মাধ্যমে। রাষ্ট্রের অন্য তিনটি উপাদান হচ্ছে নাগরিক, ভূখন্ড ও সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের মাধ্যমে প্রয়োগ করে। আর সরকার গঠিত হয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে। সরকার ব্যতীত কোন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। সরকার সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বা কৌশল তৈরি করে। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা,

জনগণের নিরাপত্তা প্রদান, জনগণের অধিকার রক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনকল্যাণ সাধন, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণসহ রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে থাকে। তাই সরকারকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের কথা চিন্তাই করা যায় না। এরিস্টটল সরকারের কার্যাবলিকে যে তিনভাবে ভাগ করেছেন তা হল– সিদ্ধান্তমূলক, শাসন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত। এ তিন ধরণের কার্যসম্পাদনের জন্য সরকারের তিন প্রকার ক্ষমতাও রয়েছে। এগুলো হচ্ছে আইন বিষয়ক ক্ষমতা, শাসন বিষয়ক ক্ষমতা ও বিচার বিষয়ক ক্ষমতা। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকার নিজস্ব তিনটি বিভাগের সাহায্যে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে। সরকারের এ তিনটি বিভাগ বা অঙ্গসমূহ হল–

(i) আইন বিভাগ (The Legislative)
(ii) শাসন বিভাগ (The Executive)
(iii) বিচার বিভাগ (The Judiciary)

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে যে বিভাগ বাস্তবায়িত করে সে বিভাগকে শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ বলে। রাষ্ট্রের সকল ধরনের প্রশাসনিক কাজকর্ম শাসন বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। সরকারের যে বিভাগ বিচারিক কার্য সম্পাদন করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সরকারের যে বিভাগ দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। বিচার বিভাগ স্বাধীন, নিরপেক্ষ থাকলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধান সমুন্নত রাখা বিচার বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব।

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাতে আইন সভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের হাতেই রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। বিচার বিভাগ উভয় বিভাগের নিয়ন্ত্রনের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত ব্যবস্থাতে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি চালু থাকে। এই নীতি মোতাবেক, প্রত্যেকটি বিভাগ যার যার অবস্থান থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে। আবার তিনটি বিভাগ যাতে করে স্বাধীনভাবে কাজ করতে যেয়ে স্বেচ্ছাচারী না হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত ব্যবস্থাতে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি চালু থাকে। এ নীতি চালু থাকলে সরকারের কোন একটি বিভাগ স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে চাইলে, অন্য দুই বিভাগের মাধ্যমে এর রাশ টেনে ধরার ব্যবস্থা থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	সরকারের অঙ্গগুলোর নাম লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হল সরকার। সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা করা অসম্ভব। সরকারকে রাষ্ট্রের মুখপাত্র বলা হয়। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশিত হয়। সরকারের অঙ্গ তিনটি। যথা– আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সরকার এ তিনটি বিভাগের মাধ্যমে তার সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে। শাসন বিভাগ সে আইন বাস্তবায়ন করে এবং বিচার বিভাগ বিচারিক কার্য-সম্পাদন ও সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের বিভাগ কয়টি?

(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে কিসের মাধ্যমে–
(ক) রাজনৈতিক দল (খ) আইন বিভাগ
(গ) সরকার (ঘ) চাপসৃষ্টিকারী দল

৩। সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে কি বলে?
(ক) আইন বিভাগ (খ) শাসন বিভাগ
(গ) বিচার বিভাগ (ঘ) নির্বাচকমন্ডলী

৪। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়–
(i) বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকলে
(ii) বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ থাকলে
(iii) বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ থাকলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

পাঠ-৯.২ আইনসভার ধারণা ও কার্যাবলি
(Concepts and Functions of the Legislature)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইনসভা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আইনসভার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আইনসভার কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আইনসভা, জনপ্রতিনিধি, আইন প্রণয়ন, সংবিধান রচনা, রাজনৈতিক চেতনা, রাজনৈতিক বৈধকরণ, রাজনৈতিক মতৈক্য।

আইনসভা

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে একটি দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। আইনসভার সদস্যগণ হলেন জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। অধ্যাপক জে ডব্লিউ গার্নার (J.W. Garner) বলেন, "সরকারের যে সকল বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত ও কার্যকরী হয় তন্মধ্যে নিঃসন্দেহে আইন বিভাগের স্থান সর্বোচ্চ।" ইংল্যান্ডের সংবিধান বিশেষজ্ঞ ওয়াল্টার বেইজট আইনসভা সম্পর্কে বলেন, "এটা হল জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের মহান চালিকা শক্তি, যেখানে সকল সমস্যার সমাধান হয় এবং সর্বক্ষেত্রে জনগণের প্রাধান্য থাকে।" আইনসভায় জনমতের যেমন প্রতিফলন হয় তেমনি জনগণের আশা-আকাঙ্খাও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তুলে ধরেন। সরকারের সকল কাজে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার আর্থিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে সংগঠন করে, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুতও করে থাকে। আইনসভা দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও তা বাতিল বা সংশোধন করতে পারে। সুতরাং আইনসভার মর্যাদা ও গুরুত্ব সীমাহীন।

আইনসভার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বর্তমানে প্রত্যেকটি দেশে সরকারের অন্যতম একটি বিভাগ হচ্ছে আইনসভা। আইন প্রণয়ণে আইনসভা কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রাচীনকালে সরকারের এ আইনসভার কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখন রাজতন্ত্রের রাজা কিংবা অভিজাততন্ত্রের অভিজাত ব্যক্তিবর্গই আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করতেন। প্রাচীন গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষ করে এথেন্সে রাষ্ট্র পরিচালনা প্রধান হিসেবে কাজ করত এসেম্বলি। এই এসেম্বলি কিছু মাত্রাতে আজকের দিনের আইনসভা হিসেবে কাজ করত। তবে আধুনিক আইনসভা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিতদের দ্বারা গঠিত হয়। পক্ষান্তরে, এ্যাসেম্বলির জন্য নির্বাচনের কোন বিধান ছিল না। প্রাচীন জার্মানীর টিউটিনদের (Teutons) শাসন ব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে বলা হয় আইনসভার জননী। অধ্যাপক মুনরো (Professor Munro) বলেন, "The British Parliament is the mother of all Parliaments." শুরুর দিকে এই আইনসভাও সাধারণ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের পরে ইংল্যান্ডে একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু হয়। তখন থেকেই ইংল্যান্ডের আইনসভা তথা পার্লামেন্ট জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হতে শুরু করে।

আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) প্রত্যক্ষ কার্যাবলি ও (খ) পরোক্ষ কার্যাবলি।

(ক) প্রত্যক্ষ কার্যাবলি ঃ

১। **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ঃ** আইন প্রণয়ন করাই হল আইন বিভাগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেশের সংবিধানের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে এবং জনমতের গতি-প্রকৃতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে। পুরাতন আইন সংশোধন এবং অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করতে পারে। বর্তমানকালে আইনসভাই আইনের সর্বপ্রকার উৎস। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারাই শাসন বিভাগ শাসন কার্য পরিচালনা করে এবং বিচারবিভাগ বিচারকার্য করে থাকে।

২। **সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত ঃ** আইনসভার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ও কাজ হচ্ছে দেশের মৌলিক আইন অর্থাৎ সংবিধান প্রবর্তন ও সংশোধন করা। কোন কোন রাষ্ট্রে আইন বিভাগ সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে কাজ করে। আবার কোন কোন দেশের আইনসভা সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গণপরিষদের (Constituent Assembly) দায়িত্ব পালন করে। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে যে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল তা গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত হয়। পাশাপাশি আইনসভা সংবিধানের যে কোন ধারা বা অনুচ্ছেদ পরিবর্তন কিংবা সংশোধন করতে পারে।

৩। **বিচার সংক্রান্ত ঃ** অনেক সময় আইন বিভাগ বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলিও সম্পাদন করে। আইনসভা এর সদস্যদের আচার-আচরণের বিচার, আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত গুরুতর অভিযোগের বিচার, নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের বিচার ইত্যাদি আইনসভার বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলির অন্তর্গত। উদাহরণস্বরূপ, গুরুতর কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে, নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হবার আগেই অভিশংসনের (Impeachment) মাধ্যমে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করতে পারে সে দেশের আইনসভা। আবার ব্রিটেনে ২০০৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত, শত-শত বছর ধরে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ড সভা সে দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে।

৪। **শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ঃ** আইনসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা। আইনসভার এরূপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করা সম্ভব হয়। তবে শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন দেশে এরূপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৫। **অর্থ-সংক্রান্ত ঃ** গণতন্ত্রে সরকারি অর্থ যেহেতু জনগণের তাই এ অর্থের যাতে অপচয় না হয় সেজন্য অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। আইন বিভাগ বিগত বছরের সরকারি আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা, পরবর্তী বছরের জন্য ব্যয় বরাদ্দকরণের মত কাজের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কার্যকর করে তোলে। আইনসভার অনুমতি ছাড়া নতুন কর (Tax) ধার্য কিংবা পুরাতন কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা যায় না।

৬। **শাসন সংক্রান্ত ঃ** আইনসভাকে শাসন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজও সম্পাদন করতে হয়। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় এমনকি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায়ও আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে শাসন সংক্রান্ত কার্যসম্পাদন করে। আইনসভা অনেক সময় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়োগ দান করে। সন্ধি বা চুক্তি অনুমোদন করা, যুদ্ধ ঘোষণা করা প্রভৃতি আইনসভার শাসন সংক্রান্ত কার্য।

৭। **নির্বাচন সংক্রান্ত ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভাকে নির্বাচন সংক্রান্ত কতকগুলো কাজ সম্পাদন করতে হয়। বাংলাদেশের আইনসভার সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ (Federal Council)-এর সদস্যদের নির্বাচিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনও প্রার্থী নির্বাচক সংস্থার (Electoral College) সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করতে না পারলে, প্রাপ্ত ভোটের

ভিত্তিতে প্রথম তিনজন প্রার্থীর মধ্যে যে কোন একজনকে প্রতিনিধি সভা (House of Representatives) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করতে পারে। ভারতে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইনসভা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮। **সংযোগসাধন সংক্রান্ত ঃ** দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিরা নিজ-নিজ অঞ্চলের জনগণের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যাবলি সম্পর্কে আইনসভায় আলোচনা করেন। এসব আলোচনার ভিত্তিতে সরকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

উপরোক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করা ছাড়াও, আইনসভা নানা ধরনের তদন্ত, বিচারকদের পদচ্যুতি, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনাসহ নানাবিধ দায়িত্ব পালন করে।

(খ) পরোক্ষ কার্যাবলি ঃ আইনসভার পরোক্ষ কার্যাবলিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **রাজনৈতিক বৈধকরণ ঃ** আইনসভা সব ধরনের সরকারের প্রণীত আদেশ, বিধিমালা বা নীতিসমূহকে বৈধতার ছাড়পত্র দিয়ে থাকে। এমনকি চরম কর্তৃত্ববাদী সর্বাত্মক শাসন ব্যবস্থায়ও আইনসভা সরকারের কার্যাবলি বৈধ করার একমাত্র মাধ্যম।

২। **রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঃ** আইনসভার নির্বাচন সাধারণ জনগণকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কাজে উদ্বুদ্ধকরণের প্রধানতম মাধ্যম। এ নির্বাচন নির্বাচকমন্ডলী ও প্রার্থীদের মধ্যে যোগাযোগের পথ তৈরি হয় এবং শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

৩। **রাজনৈতিক মতৈক্য সৃষ্টি ঃ** আইনসভার বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা জাতীয় মতৈক্য সৃষ্টি এবং বিরোধ মীমাংসার ফলপ্রসূ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মতবিরোধের বিষয়গুলো নিয়ে আইনসভাতে খোলামেলা আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটতে পারে।

৪। **বিরোধ দূরীকরণ ঃ** আইনসভা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তীব্র মতাদর্শগত বিরোধ দূরীকরণে ব্যাপক মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও, জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক বিরোধ দূর করতে পারে।

৫। **রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সংক্রান্ত ঃ** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। অনেক সময় তারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদি করেন। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে সেসব আলোচনা প্রচারিত হওয়ার ফলে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। জনগণ সরকারি ক্রিয়াকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে।

সার্বিক বিবেচনা থেকে একথা বলা যায় যে, সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে প্রত্যেকটিই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও, আইন বিভাগ এমন কতগুলো দায়িত্ব পালন করে যেগুলো গুরুত্বের বিচারে অন্য দুই বিভাগের তুলনায় এগিয়ে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	আইন সভার প্রধান প্রধান কার্যাবলি উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

সরকারের যে বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। আইনসভা এক-কক্ষ বিশিষ্ট ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হতে পারে। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় দুটি কক্ষ– নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ নিয়ে গঠিত হয়। নিম্নকক্ষকে বলা হয় জনপ্রতিনিধিত্ব কক্ষ। উচ্চকক্ষকে বলা হয় দ্বিতীয় কক্ষ। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় নিম্নকক্ষের সদস্যগণ প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত হয়। আইনসভা আইন প্রণয়ন, শাসন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত, অর্থ-সংক্রান্ত, নির্বাচনসহ বহুবিধ কার্য সম্পাদন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "সরকারের যে সকল বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত ও কার্যকরী হয় তন্মধ্যে নি:সন্দেহে আইন বিভাগের স্থান সর্বোচ্চ"– মন্তব্যটি কে করেছেন?

(ক) জে ডব্লিউ গার্নার (খ) মিশেল ফুঁকো
(গ) ওয়ালটার বেইজট (ঘ) আন্তোনিও গ্রামসি

২। "British Parliament is the mother of all Parliaments" – কে বলেছেন?

(ক) ওয়ালটার বেইজট (খ) অধ্যাপক মুনরো
(গ) আর জি গেটেল (ঘ) জে ডব্লিউ গার্নার

৩। আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে মোটামুটি কয়ভাবে ভাগ করা যায়?

(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

৪। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয় কত সালে?

(ক) ১৯৭০ (খ) ১৯৭১
(গ) ১৯৭২ (ঘ) ১৯৭৩

৫। ব্রিটেনের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নাম কি?

(ক) সিনেট (খ) লর্ডসভা
(গ) কমন্সসভা (ঘ) প্রতিনিধিসভা

পাঠ-৯.৩ এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা (Unicameral Legislature)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইনসভার গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।
- এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুবিধাগুলো জানতে পারবেন।
- এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অসুবিধাগুলো বুঝবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নির্বাচন পদ্ধতি, উচ্চ কক্ষ, নিম্ন কক্ষ, জাতীয় স্বার্থ, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন।

আইনসভার গঠন

আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা হচ্ছে আইনসভা। আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা দেশ শাসিত হয়। পৃথিবীর সব দেশের আইনসভার গঠন এক ধরনের নয়। সরকারের গঠন কাঠামো, সদস্য সংখ্যা, সদস্যপদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, কার্যকালের মেয়াদ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের আইনসভার সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে গঠন কাঠামোর দিক থেকে বর্তমান সময়ের আইনসভাগুলো প্রধানত দুই প্রকার। যথা– এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। একটি কক্ষ নিয়ে গঠিত আইনসভাকে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয়। উদাহরনস্বরূপ, বাংলাদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা চালু আছে। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা দুটি কক্ষ, অর্থাৎ নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষ নিয়ে গঠিত হয়। জনগনের দ্বারা নির্বাচিত কক্ষটি নিম্নকক্ষ (Lower House) বা জনপ্রিয় কক্ষ (Popular House) নামে পরিচিত। উচ্চকক্ষ (Upper House) কে দ্বিতীয় কক্ষ (Second Chamber) বলা হয়। নিম্নকক্ষের সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং ক্ষমতার দিক থেকে এই কক্ষটি অধিক শক্তিশালী। পক্ষান্তরে, উচ্চকক্ষের সদস্যরা বেশির ভাগ দেশে মনোনীত এবং এই কক্ষের ভূমিকা মূলত উপদেশমূলক। তবে এর কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্র আইনসভার উচ্চকক্ষ, অর্থাৎ সিনেট সদস্যরা ভোটে নির্বাচিত এবং নিম্নকক্ষ অর্থাৎ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের তুলনায় এর ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে বেশি বলে মনে করা হয়।

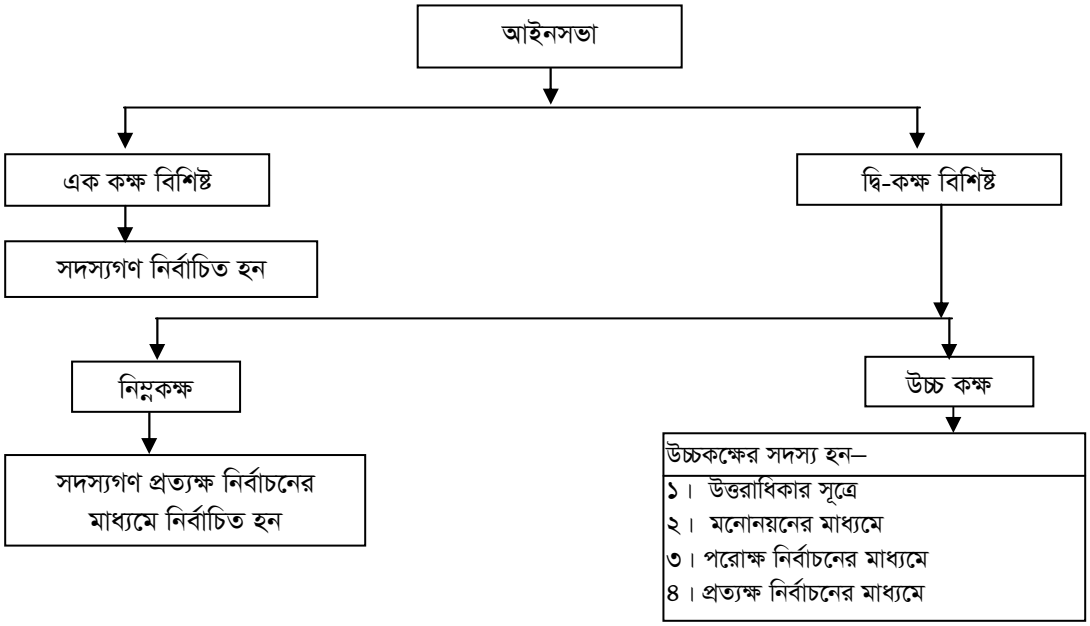

চিত্র ঃ আইনসভার গঠন

এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

সরকারের যে তিনটি বিভাগ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বিভাগ হচ্ছে আইন বিভাগ বা আইনসভা। সাংগঠনিক দিক থেকে আইনসভাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। যেসব আইনসভায় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি মাত্র কক্ষ বা পরিষদ থাকে সেগুলোকে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। সাধারণ নির্বাচন বা সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ, চীন, কিউবা, সাইপ্রাস, ডেনমার্ক, মিশর, ফিনল্যান্ড, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া, ইসরাইল, নেপাল, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণত এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary government) ব্যবস্থা প্রচলিত থাকা দেশগুলোতে এক কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা দেখা যায়।

এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুবিধাসমূহ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনেকেই এককক্ষ আইনসভার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। জনগণের সরাসরি সম্মতি, দ্রুততা, কর্মপদ্ধতিতে কম জটিলতাসহ নানাবিধ কারণে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা অনেকের কাছে বেশি আকর্ষণীয়। নিম্নে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার কিছু সুবিধা উল্লেখ করা হলঃ

১। **গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হয়। এখানে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এই কক্ষের মধ্য দিয়েই জনগণ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধীদলে থেকে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে।

২। **সহজ-সরল পদ্ধতি ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে বলা যায় একটি সহজ-সরল পদ্ধতি। এটি জনগণের কাছে সহজে বোধগম্য। এর গঠন পদ্ধতিও সরল। এখানে একটি মাত্র কক্ষ থাকবে এবং সে কক্ষের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে।

৩। **সহজ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নির্বাচন অনেকটা সহজ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এখানে একই সময়ে সারাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে জটিল কোন হিসাব নিকাশ নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন প্রাপ্ত রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করবে।

৪। **দ্রুত সিদ্ধান্ত ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় রাষ্ট্রের যে কোন জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এখানে একটি কক্ষের অনুমতি হলেই যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

৫। **অধিক দায়িত্বশীল ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা অধিক দায়িত্বশীল। জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি নির্বাচিত বিধায় জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণে তাদেরকে সচেষ্ট থাকতে হয়। অন্য কোন কক্ষের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই। এ জন্য এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সদস্যরা অধিক দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে থাকে।

৬। **আইন প্রণয়নে সুবিধা ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় জনগণের চাহিদামত সময়োপযোগী আইন দ্রুত প্রণয়ন করা যায়। যেহেতু আইন পাশ করার জন্য অন্য কোন কক্ষের উপর নির্ভরশীল নয় সেজন্য যে কোন জরুরি প্রয়োজনে জনগণের কল্যাণার্থে দ্রুত আইন প্রণয়ন করা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৃথিবীর অনেক দেশেই বর্তমানে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা চালু আছে। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার তুলনায় কম ব্যয়, কম সময়ক্ষেপণ ও সরাসরি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বের মত বৈশিষ্ট্যের কারণে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সারা বিশ্বে বেশ জনপ্রিয়।

এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অসুবিধা

পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রচলিত থাকলেও এর কিছু ত্রুটি বা অসুবিধা রয়েছে যার ফলে এর জনপ্রিয়তাকে ম্লান করেছে। নিম্নে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে যুক্তিসমূহ তুলে ধরা হল ঃ

১। **অর্থবহ আলোচনার সুযোগ কম ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় কোন একটি প্রসঙ্গে বিস্তারিত ও অর্থবহ আলোচনার সুযোগ কিছুটা কম থাকে। বিশেষ করে কোন একটি আইন সভাতে কোন একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে, বিরোধী দলীয় মতামতগুলো সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। বিশেষত, অপরিণত গণতন্ত্রের দেশগুলোতে এ সমস্যা প্রকট হয়। এ ধরনের পরিস্থিতি অনেক সময়ই দলীয় বিবেচনায় জাতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে দেখা যায়।

২। **মেধাবী ব্যক্তির শাসন থেকে বঞ্চিত ঃ** জনপ্রিয়তা হচ্ছে এক কক্ষ আইনসভার সদস্য হবার প্রধান শর্ত। এক্ষেত্রে মেধা ও দক্ষতার মত বিষয়গুলি প্রধান বিবেচ্য হয় না। এমতাবস্থায়, আইনসভাতে একটি মাত্র কক্ষ থাকলে, সেখানে নির্বাচনে ব্যর্থ বা অনিচ্ছুক অথচ দক্ষ মেধাবী ব্যক্তিদের সেবা থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়।

৩। **জাতীয় স্বার্থ বিরোধী আইন ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাতে বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়নের আশঙ্কা থাকে। দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে বঞ্চিত করার ঝুঁকি এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভাতে থাকে। এছাড়া সাময়িক আবেগ-অনুভূতি কিংবা শক্তিশালী কোন স্বার্থ গোষ্ঠীর চাপে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী আইন প্রণীত হবার আশঙ্কা থাকে।

৪। **অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার জনপ্রতিনিধিরা অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী হন। আইন প্রণয়নে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দায়বদ্ধ থাকতে হয় না। এছাড়াও পার্লামেন্টারি ব্যবস্থাতে আইন বিভাগ শাসন বিভাগের সাথে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে।

৫। **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে অনুপযোগী ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য উপযোগী নয়। বিভিন্ন রাজ্য বা প্রদেশের স্বার্থ এক কক্ষ ব্যবস্থাতে সমানভাবে রক্ষিত হয় না।

৬। **পুনর্বিচেনার অভাব ঃ** এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় কোন আইন প্রণীত হলে তা পুনর্বিবেচনার সুযোগ থাকে না। কিন্তু দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় নিম্নকক্ষে আইন প্রণীত হলে উচ্চকক্ষে সেই আইন পুনর্বিবেচনার সুযোগ থাকে। এক কক্ষ ব্যবস্থাতে পুনর্বিবেচনার সুযোগ না থাকায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বার্থে আইন প্রণয়নের আশঙ্কা থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, নানা-ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও, জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবার বিধান থাকার কারণে এক কক্ষ ব্যবস্থার মধ্যেই গণতন্ত্রের প্রধান শর্তটি সংরক্ষিত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার সুবিধাগুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

সরকারের যে তিনটি বিভাগ রয়েছে তার মধ্যে আইনসভা হচ্ছে অন্যতম। গঠন অনুযায়ী আইন সভা এক-কক্ষ ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হতে পারে। যেসব আইনসভায় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি মাত্র কক্ষ থাকে তাকে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। সাধারণত নির্বাচন ও সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের মাধ্যমে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হয়। পৃথিবীর অনেক দেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল– বাংলাদেশ, চীন, কিউবা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ইসরাইল, নিউজিল্যান্ড ও নেপাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থার নাম কি?
(ক) সুপ্রীম কোর্ট (খ) শাসন বিভাগ
(গ) আইন বিভাগ (ঘ) রাজনৈতিক দল

২। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নাম কি?
(ক) লর্ড সভা (খ) কমন্স সভা
(গ) সিনেট (ঘ) প্রতিনিধি সভা

৩। আইনসভাকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ২টি (খ) ৪টি
(গ) ৬টি (ঘ) ৮টি

৪। উচ্চকক্ষের সদস্য হন–
(i) উত্তরাধিকার সূত্রে;
(ii) মনোনয়নের মাধ্যমে
(iii) কোন কোন দেশে জনগণের ভোটে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে–
(i) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
(ii) যুক্তরাজ্যে
(iii) ডেনমার্কে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) iii

পাঠ-৯.৪ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা (Bicameral Legislature)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- উচ্চকক্ষের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুবিধাগুলো বলতে পারবেন।
- দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অসুবিধাগুলো বুঝতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সিনেট, প্রতিনিধিসভা, রাজনৈতিক শিক্ষা, জাতীয় ঐতিহ্য, শ্রেণিস্বার্থ, প্রগতি।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

দুটি কক্ষ বা পরিষদ নিয়ে যখন আইনসভা গঠিত হয় তখন তাকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বলে। এরূপ আইনসভার প্রথম কক্ষকে 'নিম্নকক্ষ' এবং দ্বিতীয় কক্ষকে 'উচ্চকক্ষ' বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, ভারতসহ পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে।

নিম্ন কক্ষের গঠন

আইনসভার নিম্ন কক্ষ কত জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে তার কোন নির্ধারিত সংখ্যা নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিম্ন কক্ষের সদস্য সংখ্যার তারতম্য রয়েছে বা থাকতে পারে। যেমন- যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন কক্ষ তথা প্রতিনিধিসভার সদস্য সংখ্যা ৪৩৫, ব্রিটেনের কমন্সসভার সদস্যসংখ্যা ৬৫২। তবে পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের নিম্ন কক্ষই প্রতিনিধিত্বমূলক। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্ন কক্ষ গঠিত হয়। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক হওয়ার কারণে সাধারনত নিম্ন কক্ষ উচ্চ কক্ষ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী।

নিম্নকক্ষের সদস্যসংখ্যা ও কার্যকাল রাষ্ট্রভেদে ভিন্ন হতে পারে। যেমন- অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের কার্যকাল ৩ বছর। পক্ষান্তরে, ব্রিটেনের কমন্স সভার কার্যকাল ৫ বছর।

উচ্চ কক্ষের গঠন

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষের কত জন সদস্য হবে তার কোন নিয়ম নেই। যেমন, মার্কিন সিনেটের সদস্য সংখ্যা ১০০ জন কিন্তু ব্রিটেনের লর্ডসভার সদস্য সংখ্যা ৮১৫ জন। আবার উচ্চ কক্ষসমূহের কার্যকালও এক নয়। মার্কিন সিনেটের কার্যকাল ছয় বছর। প্রতি দুই বছর পর এর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসরে যান। অন্যদিকে, ব্রিটেনের লর্ডসভার সঠিক কোন কার্যকাল নেই। লর্ডসভার সদস্যরা আজীবনের জন্য সদস্যপদ লাভ করেন। রাষ্ট্রভেদে উচ্চকক্ষের গঠনপ্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। যেমন-

(i) কোন কোন রাষ্ট্রে ধর্মসূত্রে উচ্চকক্ষের সদস্যপদ দেয়া হয়। যেমন, ব্রিটেনের লর্ডসভাতে চার্চ অব ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে বিশপ পদবিধারী ২৬ জন ধর্মগুরু স্থান পেয়ে থাকেন।

(ii) কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চকক্ষ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫০টি অঙ্গরাজ্য থেকে ২ জন করে মোট ১০০ জন সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন।

(iii) কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চকক্ষ মনোনীত সদস্য কর্তৃক গঠিত হয়। যেমন, কানাডার সিনেট।

(iv) কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চকক্ষ পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। যেমন, ফ্রান্সের সিনেট।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুবিধা

পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে আয়তনে বৃহৎ রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার জনপ্রিয়তা বেশি লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সুবিধাসমূহ তুলে ধরা হল-

১। সুচিন্তিত আইন প্রণয়নঃ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় যথেষ্ট বিচার বিবেচনার সাথে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল আইন প্রণীত হয়। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় কখনো কখনো আকস্মিক আবেগের বশে অবিবেচনাপ্রসূত হঠকারী ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী আইন পাশ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। এ ব্যবস্থায় পুনর্বিবেচনার কোন সুযোগ থাকে না। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় এরূপ আশঙ্কা থেকে মুক্ত। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ পাওয়া যায়। এতে বিলটির কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা ধরা পড়ে এবং সংশোধন করা হয়।

২। স্বৈরাচার রোধঃ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় স্বৈরাচার রোধ হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে লর্ড অ্যাকটন (Lord Acton) বলেন, "দ্বিতীয় কক্ষ হল স্বাধীনতার একটি অপরিহার্য নিরাপত্তা, একটিমাত্র কক্ষ নিয়ে আইনসভা গঠিত হলে তা স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।" দ্বিতীয় কক্ষের উপস্থিতি এককক্ষের স্বৈরাচার রোধ করতে পারে।

৩। নিম্ন কক্ষের সহায়কঃ বর্তমান জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আইনসভার কাজের চাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একটিমাত্র সভার পক্ষে এ সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কঠিন। আইনসভার দু'টি কক্ষ বা পরিষদ থাকলে, গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কমূলক বিলগুলো বিচার বিবেচনার জন্য নিম্ন কক্ষ প্রয়োজনীয় সময় পেতে পারে। অধ্যাপক অ্যালেন আর বল (Alan R Ball) এ প্রসঙ্গে বলেন- "Certainly the second chamber can assist the lower house with the legislative programme initiating and amending bills"

৪। বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মনোনয়নঃ প্রত্যেক দেশেই এমন অনেক জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ ব্যক্তি থাকেন যারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিড়ম্বনা ও জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে রাজি থাকেন না। উচ্চকক্ষে পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়নের দ্বারা দেশের এইসব পন্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আইনসভায় স্থান করে দেওয়া যায়। এতে দেশ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষদের সেবা লাভ করতে পারে। এর ফলে আইনসভায় জনমতের উন্নততর প্রতিফলন ঘটে।

৫। জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলনঃ দ্বি-কক্ষ ব্যবস্থায় জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটে। আইনসভার দুটি কক্ষ ভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হলে প্রবহমান জনমত যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট ব্যবস্থায় পরিবর্তনশীল জনমতের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান ও পরিমাপ করা যায়।

৬। রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারঃ উচ্চকক্ষ জনগনের রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করে। উচ্চকক্ষে প্রতিটি বিলকে পুনরায় বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। আইনসভায় বিভিন্ন আলোচনা ও বিতর্ক বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে জনগনের কাছে পৌঁছায়। এতে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে।

৭। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উপযোগীঃ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হলে, নিম্নকক্ষে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি উচ্চকক্ষে সকল প্রদেশ বা রাজ্যের প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব হয়। এতে করে আকার-আয়তন বা জনসংখ্যার কম-বেশিজনিত কারণে কোন রাজ্য বা প্রদেশ বাড়তি সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করে না।

৮। জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণঃ বহুজাতি এবং আয়তনে বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা উপযোগী। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থাতে একটি রাষ্ট্রে বাসকারী সকল ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রতিনিধি আইন সভাতে স্থান পাবার সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যায় কম হলেও, মনোনয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে আইনসভার উচ্চকক্ষে এদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, বৃহদায়ন বহুজাতি গোষ্ঠীর মানুষ বাসকারী একটি রাষ্ট্রের জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে আইনসভার কাজের চাপ প্রশমন এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয়। জে এ আর ম্যারিয়ট (J.A.R Marriot) বলেন, "Experience has been in favour of two chambers, and it is not wise to disregard the lessons of history".

দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অসুবিধা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নানাবিধ অসুবিধা নানা সময়ে চিহ্নিত করেছেন। নিম্নে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার কিছু অসুবিধা উল্লেখ করা হল-

১। অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর: অনেকের মতে, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা অনাবশ্যক এবং ক্ষতিকর। এ প্রসঙ্গে আবে সিঁয়ে মনে করেন, দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষকে অনুসরণ করে তবে এটা অনাবশ্যক। আর যদি তা প্রথম কক্ষকে অনুসরণ না করে তবে তা অনিষ্টকর।

২। অনিয়ন্ত্রিত: নিম্নকক্ষের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে উচ্চকক্ষের ভূমিকা পালন প্রসঙ্গটিকে অনেকে অতিরঞ্জিত মনে করেন। বিশেষ করে বর্তমান যুগে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নিম্নকক্ষের ইচ্ছাকে উচ্চ কক্ষ আদৌ কতটুকু প্রতিরোধ করতে পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এছাড়া নিম্নকক্ষের জনপ্রতিনিধিদের উপর উচ্চকক্ষের মনোনীত সদস্যগণ নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিধানকেও অনেকে গণতন্ত্র সম্মত নয় বলে মনে করেন।

৩। অগণতান্ত্রিক গঠন পদ্ধতি: অনেক দেশের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার গঠনপদ্ধতি অগণতান্ত্রিক। গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে আইনসভা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হওয়াটাই সঙ্গত। কিন্তু অনেক দেশেই দ্বিতীয় কক্ষ সাধারণত বিত্তবান, মনোনীত ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়।

৪। দায়িত্ব বিভক্ত: দু'টি পরিষদ নিয়ে গঠিত হলে আইনসভার দায়িত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় আইন প্রণয়নের সঠিক দায়িত্ব নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভাতে, দুটি কক্ষ অর্থাৎ হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ ও সিনেটের আইন পাস করাকে কেন্দ্র করে কখনো কখনো বিরোধ দেখা দেয়।

৫। শ্রেণিস্বার্থ প্রাধান্য: দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় কোন কোন দেশে উচ্চ শ্রেণির স্বার্থ প্রাধান্য পেয়ে যেতে পারে। ইতিহাসের একটি পর্ব পর্যন্ত উচ্চকক্ষে জনগণের সামাগ্রিক কল্যাণের পরিবর্তে উচ্চ শ্রেণির স্বার্থরক্ষার আগ্রহই বেশি প্রকাশ পেতো। এজন্য দ্বিতীয় কক্ষকে অনেকে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিস্বার্থ সংরক্ষণের দুর্গ হিসেবে সমালোচনা করতেন।

৬। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা: নানাবিধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও দ্বিতীয় পরিষদ অনাবশ্যক। কারণ সংবিধানেই বিভিন্ন উপায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। সুতরাং সদিচ্ছা থাকলে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভাতেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা যায়।

৭। আইন প্রণয়নে বিলম্ব: দ্বিতীয় কক্ষ আইন প্রণয়নকে বিলম্বিত করে। দু'টি কক্ষের মধ্যে বিরোধ বাধলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে প্রশাসন ব্যবস্থায় ধীরগতি চলে আসে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। জরুরী অবস্থায় আইন প্রণয়ন বিলম্বিত হলে তা থেকে রাষ্ট্রীয় সংকটের সৃষ্টি হতে পারে।

৮। ব্যয়বহুল এবং অপচয়মূলক: দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ব্যয়বহুল এবং অপচয়মূলক। দু'টি পরিষদ থাকলে অতিরিক্ত সরকারি অর্থ ব্যয় হবে একথা বলাই বাহুল্য। আর দ্বিতীয় কক্ষ যদি সর্বজনের পরিবর্তে উচ্চশ্রেণি বা কেবলমাত্র সরকারি দলের স্বার্থ রক্ষা করে তবে এই ব্যয় অপচয় ব্যতীত কিছুই নয়।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রদেশ বা রাজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণের দিক থেকে ফলপ্রসূ। তবে, দ্বিকক্ষ আইন সভার সদস্য বাছাই পদ্ধতিতে এখনো অবধি কোন কোন দেশে অগণতান্ত্রিক বা প্রশ্ন সাপেক্ষ নিয়ম বলবৎ আছে। এছাড়া, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি উপস্থিত না থাকলে, উচ্চকক্ষ দ্বারা নিম্নকক্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টিও অসম্ভব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার অসুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

আইনসভা দুই ধরনের হতে পারে। যথা, এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সমন্বয়ে গঠিত হয়। নিম্নকক্ষের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। এ জন্য নিম্ন কক্ষকে প্রতিনিধিত্ব কক্ষ বলা হয়। দ্বিতীয় কক্ষের মনোনয়ন ও নির্বাচন উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। দুই ধরনের আইন সভার ক্ষেত্রেই একাধারে কতগুলো সুবিধা ও অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের কার্যকাল কত বছর?
ক) ৩ বছর খ) ৪ বছর
গ) ৫ বছর ঘ) ৬ বছর

২। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কার্যকাল কত বছর?
ক) ৩ বছর খ) ৪ বছর
গ) ৫ বছর ঘ) ৬ বছর

৩। মার্কিন সিনেটের সদস্য সংখ্যা কত?
ক) ৫০ জন খ) ৭৫ জন
গ) ১০০ জন ঘ) ১২৫ জন

৪। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে–
i) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ii) বাংলাদেশ iii) নিউজিল্যান্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii, iii

৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য কয়টি?
ক) ৩০টি খ) ৪০টি
গ) ৫০টি ঘ) ৬০টি

পাঠ-৯.৫ গণতন্ত্রে আইনসভার ভূমিকা (Role of Legislature in Democracy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- গণতন্ত্রে আইনসভার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ভোট, আইন, নির্বাচন, রাজনৈতিক চেতনা, জনমত।

গণতন্ত্রে আইনসভার ভূমিকা

আইনসভা সরকারের তিনটি অঙ্গের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বস্তুত: সংবিধান প্রণয়ন কিংবা আইন প্রণয়নের মত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বলতে গেলে আইন সভা থেকেই একটি রাষ্ট্রের কার্যক্রম সূচনা হয়। জনগনের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা আইনসভার সদস্য হন। যার জন্য আইনসভাকে গণতন্ত্রের প্রতীক বলা হয়। গণতন্ত্রের সাফল্য এবং বিকাশে আইনসভার ভূমিকা অসামান্য। নিম্নে গণতন্ত্রে আইনসভার ভূমিকা আলোচনা করা হল:

১। আইন প্রণয়ন: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দেশ পরিচালনার সকল বিধি-বিধান ও আইন-কানুন আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হয়। স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়ন, এবং পরবর্তীতে জাতীয় স্বার্থের সাথে সঙ্গতি রেখে সংবিধান সংশোধন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন আইনসভাই করে থাকে।

২। সরকার ও জনগনের মধ্যে সেতুবন্ধন: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। আইনসভার সদস্যরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশ কিংবা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের খুব কাছে এসে তাদের বক্তব্য শুনতে পারেন। জনগণের সে বক্তব্য বা দাবি আইনসভার সদস্যরা আইনসভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে এ সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয় যা গণতন্ত্রে রজন্য কল্যাণকর।

৩। শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ: আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সর্বপ্রধান স্থান হচ্ছে আইনসভা। একজন ব্যক্তি নেতৃত্বের গুনাবলী, মেধা, জনকল্যাণ ও জনসংযোগের বলে, কোন একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে কিংবা নির্দলীয়ভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে আইন সভাতে স্থান করে নিতে পারেন। আর আইন সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই তিনি সর্বোচ্চ মাত্রাতে শাসনকার্যে অংশ নেন।

৪। নির্বাচন: বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা নির্বাচন সংক্রান্ত কতকগুলো কাজ সম্পাদন করে থাকে। যেমন- সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ এর সদস্যদের নির্বাচিত করে। ভারতে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে আইনসভা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫। জনমত গঠন: আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জনমত গঠন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। আইনসভার সদস্যরা সংসদে যে বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করেন তা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে বক্তব্যের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গঠিত হয়। এই জনমতের ভিত্তিতে ক্ষমতার পালা বদলের দিক ঠিক হয়।

৬। রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য ও মতামত প্রদান করেন। এগুলো বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সাধিত হয়। এর ফলে জনগণ সরকারি কার্যকলাপের উপর সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হয়।

৭। রাজনৈতিক নিয়োগঃ আইনসভা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নেতা ও প্রশিক্ষক নিয়োগে সাহায্য করে। আইনসভার সদস্য হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর আইন সভার সদস্যদের অনেকেই প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হতে দেখা যায়।

৮। রাজনৈতিক অংশগ্রহণঃ গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার নির্বাচন জনগণকে রাজনেতিক অংশগ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। এ ধরনের নির্বাচনের ফলে প্রার্থী ও নির্বাচকমন্ডলীর মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, আইনসভা প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইন প্রণয়নের কারণে সরকারের অন্য দুই বিভাগ থেকে এ বিভাগের মর্যাদা অধিকতর। আইনসভাকে অনেকে তাই 'জাতীয় মঞ্চ' বলে অভিহিত করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের আইন সভা গণতন্ত্র রক্ষায় কতটুকু সার্থক? যুক্তি দিন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বমূলক বিধায়, এ শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার গুরুত্ব অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত: আইন সভাতে আইন প্রনয়ণের মধ্য দিয়েই বলতে গেলে একটি রাষ্ট্রের কাজ শুরু হয়। আইন পাস ছাড়াও, আইন সভাতেই যাবতীয় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক সাপেক্ষে দিক নির্দেশনা ঠিক হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকার ও জনগনের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে কোন বিভাগ?
ক) শাসন বিভাগ খ) আইন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) নির্বাচন কমিশন

২। গণতন্ত্রের প্রতীক বলা হয় কোন সংস্থাকে?
ক) আইনসভা খ) বিচার বিভাগ
গ) শাসন বিভাগ ঘ) নির্বাচকমণ্ডলী

৩। 'জাতীয় মঞ্চ' বলা হয় কোন বিভাগকে?
ক) শাসন বিভাগ খ) বিচার বিভাগ
গ) আইন বিভাগ ঘ) উপরের সবগুলো

পাঠ-৯.৬ আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ
(Causes of Limiting Power of the Legislature)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সার্বভৌমত্ব, অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন, সামরিক বাহিনী, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, গণ-সংযোগ।

আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের প্রাধান্য বৃদ্ধি এবং এর পাশাপাশি আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। একটি সময় পর্যন্ত সংবিধান বিশেষজ্ঞদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল আইনসভার সার্বভৌমত্ব। সে সময় অধিকাংশ দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় আইনসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ দেশের শাসন ব্যবস্থাতেই শাসন বিভাগের ক্ষমতার বিস্তার এবং আইনসভার ক্ষমতা ও প্রভাবের অবসান পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অধ্যাপক কে সি হোয়ার (Professor. K.C. Wheare) এর মতে "দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে"। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryec) তাঁর 'Modern Democracies' শীর্ষক গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নিম্নে আইনসভার ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাসের সাধারণ কারণ আলোচনা করা হল।

১। জনকল্যাণমূলক দায়িত্বের সম্প্রসারণঃ বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের বেশিরভাগ শাসন বিভাগই সম্পাদন করে। সমাজকল্যাণমূলক কাজ-কর্মের বিপুল দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আইনসভা এ ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ নীতিনির্ধারণ এবং তা কার্যকর করে। ফলে শাসনবিভাগের সাথে জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন জীবনের গভীর সংযোগ স্থাপিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই জনগন আইনসভার পরিবর্তে শাসন বিভাগের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

২। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধিঃ বিংশ শতকের প্রথমার্ধে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, বিংশ শতাব্দীর ঠান্ডা লড়াই, সাম্প্রতিককালে মৌলবাদ, জাতিগত সংঘাতসহ নিত্য-নতুন সংকট ও আশংকা এবং অর্থনীতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ার বাস্তবতাতে, শাসন বিভাগের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতির জটিলতা ও জটিল পরিস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ফলশ্রুতিতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠেছে। সামরিক ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে গোপনীয়তা রক্ষা করা দরকার। আইনসভার সদস্যদের খোলামেলা আলোচনায় তা আবার সম্ভব হয় না। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন-নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বোপরি জাতীয় সংকট ও জরুরি অবস্থায় আইনসভা অনেক সময় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারায় এর ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

৩। দলীয় ব্যবস্থার কঠোরতাঃ বর্তমানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা কার্যত ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছামাফিক কাজ করে। রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার বিস্তার, সুসংগঠিত দলীয় ব্যবস্থা ও দলীয় নিয়মানুবর্তিতার বদৌলতে মন্ত্রিসভা আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন

করে। সংখ্যারগরিষ্ঠ দলের নেতারাই সরকারে স্থান লাভ করেন। সরকারের স্থায়িত্ব আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। তাই সরকারি দল দলীয় নির্দেশ ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে সতর্ক ও কঠোর হয়। আইনসভার ভিতরে শাসকদলের সদস্যরা দলীয় নির্দেশ অনুসারে কথা বলেন ও কাজ করেন। দলের বাইরে গেলে পরবর্তীতে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকে। দলীয় নির্দেশ মান্য করা অথবা অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে বরণ করা এ দুয়ের মধ্যে আইনসভার সদস্যরা সাধারণত প্রথমটিকেই গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে, বর্তমানে অনেক দেশে আইনসভা শাসন-বিভাগীয় নির্দেশ অনুমোদনের একটি সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

৪। আইন প্রণয়ন ও আর্থিক বিষয়ে ক্ষমতা হ্রাস: বর্তমানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভার ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। এখন শাসন-বিভাগই অধিকাংশ আইনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আইনসভায় উত্থাপিত বিলের মধ্যে অধিকাংশই সরকারি বিল। এছাড়া অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের উপর আধুনিক আইনসভার নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে গেছে। কেননা, আইনসভার সাধারণ সদস্যরা বাজেট প্রস্তাব বা অর্থ বিল উত্থাপন করেন না। মন্ত্রীরাই এ কাজ করেন। আর্থিক বিষয়ের জটিলতা, প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ-জ্ঞানের অভাব এবং সময়ের স্বল্পতার জন্যও অনেক সময় বাজেট প্রস্তাব নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার অবকাশ থাকে না।

৫। অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন: আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবিধ আইনের প্রয়োজন হয়। আইনের জটিলতা, সদস্যদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব সর্বোপরি সময়ের অভাবের জন্য আইনসভা আইন প্রণয়নের কিছু ক্ষমতা বাধ্য হয়ে শাসন বিভাগের হাতে অর্পন করে। ফলে শাসন বিভাগকে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করতে হয়। একে অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন (Delegated legislation) বলে। এর ফলে আইন বিভাগের উপর শাসন বিভাগের প্রভাব বেড়ে চলেছে।

৬। সদস্যদের অদক্ষতা: আজকের যুগে একটি আইনসভাকে অতীত আমলের তুলনায় অনেক বেশি জটিল ও দক্ষতা দাবিকারী সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এসব সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র আন্তরিকতা বা সাধারণ জ্ঞান দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হয় না। এজন্য একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বিশেষায়িত জ্ঞান প্রয়োজন। উন্নয়নশীল অনেক দেশেই আইন সভার সদস্যদের অদক্ষতা একটি বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে। এহেন বাস্তবতাতে শাসন বিভাগের দক্ষতাসম্পন্ন আমলাদের ভূমিকা শাসনকার্য পরিচালনাতে বড় হয়ে উঠেছে।

৭। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর গুরুত্ব: আইনসভা সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ সাধনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Groups) ও সংগঠন জনগণের স্বার্থ ও সমস্যাদি সম্পর্কে সরাসরি শাসন বিভাগে সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার এবং সরকারের সাথে জনগণের সংযোগ সাধনের মাধ্যম হিসেবে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে আইন সভার গুরুত্ব কমছে।

৮। সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ: তৃতীয় বিশ্বের অনেক উন্নয়শীল রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে সামরিক বাহিনী শাসন ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে। তখন আইনসভা স্থবির হয়ে পড়ে। সামরিক সরকারের মাধ্যমে তখন দেশ পরিচালিত হয় এবং আইনসভার ভূমিকা বিলুপ্ত হয়। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, আইন সভা স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব হারাতে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইদানীংকালে সারা বিশ্বেই নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা বাড়ছে। আইন সভাকে নানান ক্ষেত্রেই অতীত আমলের তুলনায় কিছুটা হলেও কম ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে। তথাপি, সংবিধান ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকার কারণে এ বিভাগটি এখন অবধি অনেকের দৃষ্টিতে সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আইন সভার ক্ষমতা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে- আপনি কি এই মতের সাথে একমত? ব্যাখ্যা করুন।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আইনসভার ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। নানাবিধ বাস্তবতায় জনগণের সাথে আইনসভার সদস্যদের সম্পৃক্ততা কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে, শাসন বিভাগের সদস্যদের সাথে নানা কারণে জনগনের সংযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বহুমুখী জটিলতার যুগে আইনসভার সদস্যরা অনেক সময় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আইনসভার সদস্যদের অনেকের দক্ষতার অভাবও আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের জন্য অন্যতম প্রধান কারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "Modern Democracies" নামক গ্রন্থের লেখক কে?
ক) কে সি হোয়ার খ) লর্ড ব্রাইস
গ) হ্যারল্ড লাসওয়েল ঘ) অ্যালান বল

২। 'দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আইনসভার ক্ষতা হ্রাস পেয়েছে।' – উক্তিটি কে করেছেন?
ক) ম্যাকাইভার খ) হ্যারল্ড লাস্কি
গ) কে সি হোয়ার ঘ) জন লক

৩। আইনসভার ক্ষমতা হ্রাসের কারণে কোন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে?
ক) শাসন বিভাগ খ) বিচার বিভাগ
গ) নির্বাচন কমিশন ঘ) নির্বাচকমণ্ডলী

৪। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে সংবিধান বর্হিভূত বলে বাতিল ঘোষণা করতে পারে কে?
ক) শাসন বিভাগ খ) সচিবালয়
গ) দুর্নীতি দমন কমিশন ঘ) সুপ্রীম কোর্ট

পাঠ-৯.৭ শাসন বিভাগের গঠন ও কার্যাবলি
(Composition and Functions of the Executive)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শাসন বিভাগের গঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	প্রতিরক্ষা দপ্তর, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, অর্থদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আমলা।

শাসন বিভাগের গঠন

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগের প্রাধান্য বেড়ে চলার লক্ষণ সুস্পষ্ট। ব্যাপক অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী (Chief Executive) থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলকেই বোঝায়। শাসন বিভাগের দুইটি অংশ আছে ঃ (ক) রাজনৈতিক অংশ এবং (খ) অ-রাজনৈতিক অংশ।

(ক) রাজনৈতিক অংশঃ শাসন বিভাগের যেসব ব্যক্তি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন তাঁদেরকে শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ বলা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে এরা শাসন বিভাগে যোগ দেন। কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর এদের পুনরায় নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশকে সরকারের নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। এ দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে আইনসভার কাছে এবং চূড়ান্ত বিচারে নির্বাচকমন্ডলীর কাছে। এ দায়িত্বের প্রকৃতি হল প্রত্যক্ষ। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার সদস্যদের কথা বলা যায়।

(খ) অ-রাজনৈতিক অংশঃ অপরদিকে সরকারের স্থায়ী কর্মচারীদের শাসন বিভাগের স্থায়ী বা অ-রাজনৈতিক অংশ বলা হয়। এরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে গুণগত যোগ্যতার ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে শাসন বিভাগে যোগ দেন। এদের নিযুক্তির ব্যাপারে নির্বাচনী রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। স্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের 'আমলা' নামেও অভিহিত করা হয়। শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারণ করেন এবং তার বাস্তবায়নের দিকে নজর রাখেন। আর সরকারের আমলা বা স্থায়ী কর্মচারীরা নীতিগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করেন।

শাসন বিভাগের কার্যাবলি

জাতি-রাষ্ট্র (Nation-state) প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে মনে করা হত যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই হল শাসন বিভাগের কাজ। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায়, নির্দিষ্টভাবে বললে, বিংশ শতাব্দীতে এসে, রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের পরিধি বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। নানাবিধ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বেড়ে চললেও, এই একবিংশ শতাব্দীতেও রাষ্ট্রের নানাবিধ ভূমিকা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রের কার্যাবলি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই শাসন বিভাগের কর্মপরিধি বিস্তৃতি লাভ করেছে। আধুনিক রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ যেসব কাজ সম্পাদন করে সেগুলোর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল-

১। অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনাঃ আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন শাসন বিভাগ কার্যকর করে। আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীকে বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করা, বিচারালয়ের রায় অনুসারে অপরাধীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা প্রভৃতির

মাধ্যমে শাসন বিভাগ দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। তাছাড়া অধঃস্তন সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এবং পদচ্যুতি বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, জরুরি অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি প্রভৃতি শাসন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২। পররাষ্ট্র সংক্রান্ত: বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে দাবি করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। শাসন বিভাগের প্রধানই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করেন। নিজ রাষ্ট্রের কূটনৈতিক অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ, অন্য রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি গ্রহণ, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন; কোন রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে কিংবা কোন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রয়োজন ইত্যাদি নির্ধারণ করা শাসন বিভাগের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কার্যাবলির অন্তর্ভূক্ত। এসব কাজের দায়িত্ব পররাষ্ট্র দপ্তরের উপর অর্পিত হয়।

৩। প্রতিরক্ষা কার্যাবলি: দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার গুরুদায়িত্ব শাসন বিভাগের ওপরে ন্যস্ত থাকে। সাধারণভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধান সৈন্যবাহিনীর গঠন, পরিচালনা, যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং দেশ রক্ষার প্রয়োজনে বেসামরিক শক্তিকে কাজে লাগানো প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে। রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজনবোধে সামরিক আইনও জারি করতে পারেন। যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রতিরক্ষা দপ্তরের (Defence Department) উপর ন্যস্ত থাকে।

৪। আইন সংক্রান্ত কার্যাবলি: সংসদীয় ব্যবস্থাতে আইন ও শাসন বিভাগের নেতৃত্বে সাধারণত একই ব্যক্তি থাকে বিধায়, আইন বিভাগের উপরে শাসন বিভাগের স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের হস্তক্ষেপ চলে আসে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি ছাড়া আইন বিভাগের আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি চালু থাকলেও, আজকের দিনে রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত ব্যবস্থাতে আইন সভার উপরে রাষ্ট্রপ্রধানের অনেকখানি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৫। বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি: রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ প্রধান বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। বিচার বিভাগ কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন, শাস্তির পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি রাষ্ট্রপ্রধান সম্পাদন করেন। তাছাড়া শাসন বিভাগের কোন কর্মচারীর অন্যায় আচরণ কিংবা দুর্নীতির বিচার ও শাস্তি দান, কোন সরকারি কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করা হয়েছে কিনা তার বিচার শাসন বিভাগ করে থাকে। এরূপ বিচারকে শাসন বিভাগীয় বিচার বলা হয় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে এরূপ শাসন বিভাগীয় বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

৬। অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি: সরকারের যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই বিপুল অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব প্রধানত শাসন বিভাগের। অবশ্য আইন বিভাগের অনুমোদন না পেলে শাসন বিভাগ অর্থ ব্যয় করতে পারে না। কর সংগ্রহ ও ব্যয় বরাদ্দ করা ছাড়াও শাসন বিভাগকে সরকারি কোষাগারের হিসাব পরীক্ষা করতে হয়। অর্থদপ্তর (Finance Department) এর হাতে এ ক্ষমতা অর্পিত থাকে।

৭। জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি: আধুনিক রাষ্ট্রে জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, কৃষি, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি জনকল্যাণকর কার্যাদি শাসন বিভাগই সম্পাদন করে।

৮। নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ: স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি থাকতে হয়। সরকারের শাসন বিভাগ এ নীতি নির্ধারণ করে। ব্রিটেন, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার দেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট এ নীতি প্রণয়ন করে তাকে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের দাযিত্ব এবং ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকে।

৯। আইন বলবৎকরণ সংক্রান্ত কাজ: শাসন বিভাগের অন্যতম মুখ্য কাজ আইন বলবৎ করা। সব ধরনের সরকারেই আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে শাসন বিভাগ সঠিকভাবে বলবৎ করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সরকারের

তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে শাসন বিভাগ বিশ্বস্ততার সাথে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যাবলি উত্তরোত্তর বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শাসন বিভাগ ক্রমশ: ক্ষমতাশালী হয়ে উঠার একটি প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশেষ করে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগের প্রাধান্যের পরিবর্তে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত শাসনব্যবস্থাতেও দলীয় শাসনের মাধ্যমে শাসন বিভাগ আইন বিভাগকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হচ্ছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শাসন বিভাগের অপরিহার্য কাজ গুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

শাসন বিভাগ আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাস্তবায়ন করে। আইনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আর এ আইনকে কার্যকর করে শাসন বিভাগ। রাষ্ট্রের সকল ধরনের প্রশাসনিক কার্যাবলি শাসন বিভাগ সম্পাদন করে। শাসন বিভাগের দুইটি অংশ রয়েছে। যথা– রাজনৈতিক অংশ এবং অ-রাজনৈতিক অংশ। শাসন বিভাগ আইন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত, অর্থ-সংক্রান্ত, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত, অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্তসহ বহুবিধ কার্য সম্পাদন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শাসন বিভাগের কয়টি অংশ আছে?
ক) ২টি খ) ৪টি
গ) ৬টি ঘ) ৮টি

২। অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করতে পারেন কে?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপ্রধান
গ) স্পীকার ঘ) প্রধান বিচারক

৩। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহবান করেন কে?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) স্পীকার
গ) রাষ্ট্রপ্রধান ঘ) প্রধান বিচারপতি

৪। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা দেখা যায় কোন দেশে?
ক) বাংলাদেশ খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ) ভারত ঘ) ব্রিটেন

পাঠ-৯.৮ শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি (Growth of Power of the Executive)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ উপস্থাপন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	অর্থনৈতিক সংকট, যুদ্ধ, জাতির মুখপাত্র, সুযোগ্য নেতৃত্ব, সংসদীয় সরকার।

শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ

সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে; আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রের সকল সিদ্ধান্ত সরকার তার তিনটি বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে তাকে। তবে সাম্প্রতিক কালে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের ক্ষমতা অন্য দুই বিভাগের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির নানাবিধ কারণ রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১। রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বৃদ্ধি: বর্তমান আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে কাজের পরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশরক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের মত সনাতনী কাজের বাইরে বর্তমান কালের প্রতিটি রাষ্ট্রকে বিপুল মাত্রাতে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে হয়। আর এসব দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর মানে হচ্ছে রাষ্ট্রের বা সরকারের কাজ বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল বাস্তবে শাসন বিভাগের কাজ তথা ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া।

২। আইন প্রণয়নে জটিলতা: বর্তমানে নানাবিধ কারণে আইন প্রণয়নে ব্যাপকতা ও জটিলতা বেড়ে যাবার কারণে, অনেক সময় আইনসভা তার কাজ করতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। এমত বাস্তবতায় অনেক সময় আইনসভা নিজে উদ্যোগী হয়ে আইন প্রণয়নের অনেকটুকু কাজ শাসন বিভাগের হাতে তুলে দিচ্ছে। এর ফলে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যা: রাষ্ট্রের নানাবিধ অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারের অন্য দুই বিভাগ থেকে শাসন বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যার জন্য শাসন বিভাগের সাথে সাধারণ জনগণের সংশ্লিষ্ট হওয়ার সুযোগ বেশি সৃষ্টি হয়। এছাড়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকট মুহূর্তে শাসন বিভাগ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৪। যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সমস্যা: আধুনিক বিশ্ব নানা ধরনের যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সমস্যায় জর্জরিত। এ ধরনের সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণত শাসন বিভাগেই মূল ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও প্রতিটি রাষ্ট্রে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে শাসন বিভাগ। দেশরক্ষার ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব হাতে থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৫। হস্তান্তরিত আইনের প্রাধান্য: সাম্প্রতিক কালে আইন প্রনয়ণ জটিল, সময় সাপেক্ষ ও বিশেষজ্ঞজ্ঞানের দাবীদার হয়ে উঠায় এক প্রকার বাধ্য হয়ে শাসন বিভাগের হাতে আইন প্রনয়ণের অনেকটুকু অংশ হস্তান্তর করে। আইন বিভাগ কর্তৃক দায়িত্ব হস্তান্তরের আধিক্যের কারণেও আইন সভার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের অভাব: তত্ত্বগতভাবে আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা। কিন্তু দলব্যবস্থা ভিত্তিক সরকারের এ যুগে বাস্তবে শাসন বিভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী আইনসভার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ফলে শাসন বিভাগই শেষাবধি ক্ষমতা চর্চায় এগিয়ে যায়।

৭। জাতির মুখপাত্র ও প্রতিনিধি: দেশের প্রধান নির্বাহী কর্তা সমগ্র জাতির মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হিসেবে দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করেন। পরিচালনার ক্ষেত্রে ও সর্বোচ্চ নির্বাহীর ভূমিকাই প্রধান হয়ে উঠে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের কাজকর্ম

পরিচালনায় সর্বোচ্চ নির্বাহীর ভাবমূর্তি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং এর মধ্য দিয়ে শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৮। তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা: সরকারি কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত শাসন বিভাগের কাছেই থাকে। এসব তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে শাসন বিভাগ জনগণের জন্য যেসব অত্যাবশ্যকীয় কাজ করে তাতে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

সবশেষে বলা যায়, বর্তমান কালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলিতে নানাবিধ কারণে আইনসভার ঐতিহ্যগত প্রাধান্য কিছুটা হলেও হ্রাস পাচ্ছে। পক্ষান্তরে, সরকারি কর্মকান্ডের পরিধি বেড়ে যাওয়া এবং পরিস্থির দাবী অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতা থাকার বদৌলতে, আজকের দিনে সরকারি কার্যক্রম পরিচালনাতে শাসন বিভাগের প্রভাব বেড়ে চলেছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	শাসন বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

সাম্প্রতিককালে শাসন বিভাগের কার্যাবলি অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে শাসন বিভাগের ক্ষমতাও বেড়েছে। রাষ্ট্রপতিশাসিত এবং সংসদীয় উভয় ধরনের শাসন ব্যবস্থাতেই শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। শাসন বিভাগ রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক ও প্রতিরক্ষামূলক কার্য সম্পাদন করে থাকে। শাসন বিভাগ রাষ্ট্রের সামগ্রিক নাগরিকের সাথে সম্পৃক্ত থেকে জনকল্যাণমূলক কাজ করে। মূলত আধুনিক জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের দ্রুততা ও দক্ষতার কারণে ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের কোন বিভাগটি জনগনের সাথে বেশি সম্পৃক্ত হতে পারে ?
ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) নির্বাচন কমিশন

২। অর্থনৈতিক সঙ্কটময় সময়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে কোন বিভাগ ?
ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) দাতা সংস্থা

৩। প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে কোন বিভাগ?
ক) আইন বিভাগ খ) বিচার বিভাগ
গ) শাসন বিভাগ ঘ) জন প্রশাসন বিভাগ

৪। মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব হয় কখন?
ক) নির্বাচনের পর খ) সংবিধান প্রণয়ন হলে
গ) ভোটের মাধ্যমে ঘ) সংবিধান স্থগিত হলে

পাঠ-৯.৯ বিচার বিভাগের গঠন ও কার্যাবলি
(Composition and Functions of the Judiciary)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিচার বিভাগের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আইনের অনুশাসন, উচ্চ আদালত, দন্ড বিভাগ, মামলা-মোকদ্দমা, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।

বিচার বিভাগের গঠন

বিচার বিভাগ সরকারের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রীয় আইন গুলো ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে। এছাড়াও বিবাদ মীমাংসা করা হচ্ছে বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। আইন সভার কোন সিদ্ধান্ত সংবিধান সম্মত হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারেও বিচার বিভাগ বক্তব্য রাখতে পারে। সরকারের নির্বাহী বিভাগের সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও বিচার বিভাগ বক্তব্য রাখতে পারে। নিম্নে বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো উল্লেখ করা হল:

১। নিম্নস্তর আদালত: যে আদালতে নাগরিকদের অধিকার, অপরাধ, বিরোধ সংক্রান্ত মামলা সম্পন্ন হয় তাকে নিম্নস্তর আদালত বা অধ:স্তন আদালত বলে। নিম্নস্তরের আদালতকে অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ফৌজদারি আদালত ও দেওয়ানি আদালত। জনগণের বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সংক্রান্ত মামলার বিচার করা হয় ফৌজদারি আদালতে এবং নাগরিকদের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলার বিচার করা হয় দেওয়ানি আদালতে।

২। মধ্যস্তরের আদালত: মধ্যস্তরের আদালতে মূলত নিম্ন আদালতে প্রদত্ত রায়ের পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করা হয়। এসব আদালতে কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ মামলার প্রথম শুনানী ও বিচার করা হয়। এ স্তরে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত কার্যকর থাকে। মধ্যস্তরের দেওয়ানি মামলার জন্য বাংলাদেশে "জেলা জজ আদালত" এবং ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির জন্য "দায়রা জজ আদালত" রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অতিরিক্ত জেলা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত বর্তমানে বাংলাদেশে দায়রা জজ আদালতের সমপর্যায়ের "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত" নামে একটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছে।

৩। উচ্চ আদালত: উচ্চ আদালত হল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। উচ্চ আদালতের প্রধান বা মূল কাজ হল মধ্যস্তরের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি গ্রহণ ও বিচার করা। এছাড়া উচ্চ আদালত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত বিভিন্ন মামলার শুনানি গ্রহণ ও বিচারকার্য সম্পাদন করে। উচ্চ আদালতের দুটি বিভাগ থাকে। যথা: হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ।

বিচার বিভাগের কার্যাবলি

বিচার বিভাগ সরকারের প্রধান তিনটি বিভাগের একটি। তবে সরকারের অন্য দুইটি বিভাগ জনপ্রতিনিধি নির্ভর হলেও, বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। বিচার বিভাগ যে কোন রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের প্রধান কাঠামো। এই বিভাগটি তত্ত্বগতভাবে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার উর্ধ্বে থেকে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার ভিত্তি কাজ করে। অ্যালান বলের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের কার্যাবলির পরিমাণ বিশেষীকরণের মাত্রার (degree of specialization) উপর নির্ভরশীল। নিম্নে বিচার বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করা হল:

১। বিচার সংক্রান্ত কাজঃ বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হল দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধান অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে বিচারিক কার্য সম্পাদন করা। এ জন্য বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অপরাধীর দন্ডবিধান করে। আদালতে যে সকল মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হয় সে সমস্ত মামলার বাদী-বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর আইনানুযায়ী নিরপেক্ষভাবে বিচারের রায় ঘোষণা করা বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ। বিচার বিভাগ নির্ভীক, নির্লোভ ও নিরপেক্ষভাবে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার করে অপরাধীর শাস্তি প্রদান ও নিরপরাধীকে মুক্তি প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার ও আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

২। আইনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কাজঃ বিচার বিভাগ আইনসভা প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান এবং যথাযথভাবে তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করে। বিচার বিভাগ যদি কোন আইনকে কিংবা আইনের ভাষাকে অস্পষ্ট বা পরস্পর বিরোধী বলে মনে করে তাহলে বিচারপতিগণ আইন প্রণেতাদের ধ্যান-ধারণা বিশ্লেষনের মাধ্যমে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

৩। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজঃ অনেক সময় বিচার কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে প্রচলিত আইন যথেষ্ট নয় বলে বিচারপতিরা মনে করতে পারেন। সেক্ষেত্রে বিচারাধীন কোন মামলার রায় দানকালে তারা আইনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আইনের এই ব্যাখ্যা পরবর্তী সময়ে নজির হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে বিচারকগণ প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নতুন আইনের সৃষ্টি করেন। এসব আইনকে 'বিচারক প্রণীত আইন' (Judgmande laws) বলা হয়।

৪। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাঃ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আদালতের সম্মুখে আনীত যেকোন বিরোধের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বিচারপতিদের বাস্তব ঘটনাবলি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে নথিপত্র, সাক্ষ্য-প্রমাণ ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলাতেই বিচার বিভাগকে সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে অপরাধীর শাস্তি বিধান করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পবিত্র কর্তব্য পালন করতে হয়।

৫। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও সংবিধানের ব্যাখ্যাঃ আইনসভা প্রণীত কোন আইন কিংবা শাসন বিভাগের কোন আদেশ যখন সংবিধানের বিরোধী হয় তখন সেই আইন বা আদেশকে বাতিল করে দেওয়ার যে ক্ষমতা বিচার বিভাগের হাতে থাকে তাকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review) বলা হয়। সংবিধান বিরোধী আইন বা নির্দেশ বাতিল করে দিয়ে বিচার বিভাগ সংবিধানের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করে। তাছাড়া অনেক সময় বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে কোন বিরোধ নিষ্পত্তি কিংবা কোন আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে।

৬। পরামর্শ দানের ক্ষমতাঃ কোন কোন দেশে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগকে পরামর্শদান করে থাকে। ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্ট সাংবিধানিক বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ দিতে পারে। তবে তিনি সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন।

৭। শাসন সংক্রান্ত কাজঃ বিচার বিভাগ বিচারিক কার্য ছাড়াও কিছু শাসন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। বিচার বিভাগ নিজ বিভাগের কর্মচারীদের নিয়োগ দান করেন। নাবালকের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনা করেন এবং তাদের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। আইন ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান করে, দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদায়কারী ভূমিকা পালনের মত কাজগুলি বিচার বিভাগ করে থাকে।

৮। নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজঃ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে। যে দেশে লিখিত সংবিধান রয়েছে সেখানে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সংবিধানের গন্ডির মধ্যে থেকে কাজ করতে হয় সরকার যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে বিচার বিভাগ সেই অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিচার বিভাগের ভূমিকা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বিচার বিভাগ দেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষ ভূমিকার উপর নাগরিকের অধিকারের নিশ্চয়তা নির্ভর করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো উল্লেখ করুন।

সার-সংক্ষেপ

সরকারের যে বিভাগ বিচারিক কার্য-সম্পাদন করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সরকারের যে বিভাগ দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করে তাকে বিচার বিভাগ বলে। প্রায় সব দেশের বিচার বিভাগের সাংগঠনিক রূপের সাদৃশ্য রয়েছে। বিচার বিভাগ সাধারণত তিনটি স্তরে গঠিত হয়। যথা– নিম্নস্তর আদালত, মধ্যস্তরের আদালত ও উচ্চ আদালত। বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ, সংবিধানের ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণসহ গণতন্ত্রের স্বরূপ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিম্নস্তরের আদালতকে অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?

ক) ২ খ) ৪

গ) ৬ ঘ) ৮

২। নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে কোন বিভাগ?

ক) আইন বিভাগ খ) বিচার বিভাগ

গ) শাসন বিভাগ ঘ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

৩। বিচার বিভাগের কাজ হল–

i. আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ii. অপরাধীন শাস্তি প্রদান iii. সংবিধান প্রণয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৯.১০ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা (Role of the Judiciary to Establish Rule of Law)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ন্যায়বিচার, সংবিধানের প্রাধান্য, মৌলিক অধিকার, সাম্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা

আইনের শাসনের অর্থ হল আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। শাসক-শাসিত, ধনী-গরিব, জাতি, ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ আইনের অধীনে থাকবে। আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়। যেখানে আইনের শাসন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এ ভি ডাইসি (A.V. Diecy) মনে করেন আইনের শাসনের অর্থ হল–

(i) আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান
(ii) সকলের জন্য একই ধরনের আইন থাকবে;
(iii) কাউকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করা যাবে না;
(iv) কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে না এবং
(v) অভিযুক্তকারীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। নিম্নে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা আলোচনা করা হল:

১। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান ভিত্তি হল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। বিচার বিভাগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারিক কার্য সম্পাদন সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা তথা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকাই প্রধান।

২। সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা: বিচার বিভাগের অন্যতম কাজ হল সংবিধানের ব্যাখ্যা দেওয়া। এজন্য সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক বলা হয় বিচার বিভাগকে। সংবিধান রক্ষার মাধ্যমে জনগণের অধিকার নিশ্চিত হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

৩। মৌলিক অধিকার রক্ষা: মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোন ব্যক্তির যদি মৌলিক অধিকার খর্ব হয় এবং তিনি যদি আইনের আশ্রয় নেন তাহলে বিচার বিভাগ তাঁর মৌলিক অধিকার রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এভাবে বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করে।

৪। সাম্য প্রতিষ্ঠা: বিচার বিভাগ সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান। বিচার বিভাগ সমাজে সকলের জন্য একই বিচারের মানদন্ড নিশ্চিত করে আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

৫। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা: ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় বিচার বিভাগ অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে তার চিন্তা, কর্ম, চলাফেরা স্বাধীনভাবে করতে পারে বিচার বিভাগ তা নিশ্চিত করে আইনের শাসন রক্ষা করে থাকে।

৬। বাক্ স্বাধীনতা রক্ষা: বাক্ স্বাধীনতা ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ নাগরিকের মৌলিক অধিকার। বাক্ স্বাধীনতা রক্ষা বিচার বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। বিচার বিভাগ নাগরিকের বাক্ স্বাধীনতা রক্ষার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

৭। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান: বিচার বিভাগ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

৮। স্বেচ্ছাচারিতা রোধঃ আইন ও শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা রোধে বিচার বিভাগ অনন্য ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন এবং শাসন বিভাগের কার্যক্রম, বিচার বিভাগ "তার বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা ব্যবহারের" মাধ্যমে বাতিল করে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

৯। বিরোধ নিষ্পত্তিঃ রাষ্ট্রে বিরাজমান বিভিন্ন ধরনের বিরোধ বিচার বিভাগ মীমাংসা করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন নিয়ে কখনো-কখনো বিরোধ সৃষ্টি হয়। সাংবিধানিক উপায়ে এ ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি করে বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

১০। সংকট নিরসনে ভূমিকাঃ সমাজে অনেক সময় বিভিন্ন ইস্যুতে সংকট সৃষ্টি হয়। এ ধরনের সংকট নিরসনে বিচার বিভাগ এগিয়ে আসে। বিচার বিভাগের বৈধ-অবৈধ ঘোষণার মাধ্যমে এ সংকট দূর হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং দলীয় হস্তক্ষেপমুক্ত বিচার বিভাগের মাধ্যমেই সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগ কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে?

সার-সংক্ষেপ

আইনের শাসনের অর্থ হল আইনের প্রাধান্য স্বীকার করা এবং আইন অনুযায়ী শাসন করা। আইনের শাসনকে বলা যায় নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। অধ্যাপক ডাইসির আইনের শাসনের ব্যাখ্যা অনুসারে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ প্রতিটি রাষ্ট্রে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিচারকগণ আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নতুন আইন সৃষ্টি করেন এবং আইনের শাসনকে নিশ্চিত করে। বিচার বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। বিচার বিভাগ আপিল ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। সংবিধান সমুন্নত রাখা বিচার বিভাগের অন্যতম একটি দায়িত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'আইনের শাসন' মতবাদের প্রবক্তা কে?
ক) নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি খ) টমাস হবস
গ) জন লক ঘ) এ ভি ডাইসি

২। সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক বলা হয় কাকে?
ক) আইন বিভাগকে খ) বিচার বিভাগকে
গ) রাষ্ট্রপ্রধানকে ঘ) শাসন বিভাগকে

৩। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে কে?
ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশন

৪। আইনের শাসনের অর্থ হল–
i. আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান
ii. কাউকে বিনা অপরাধে আটক করা যাবে না
iii. সকলের জন্য একই ধরনের আইন থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৯.১১ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of Judiciary)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ, ন্যায়বিচার।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অসম্ভব। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশত হিসেবে বিচার ব্যবস্থা ও বিচারপতিদের নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতার কথা বলা হয়। নিরপেক্ষ ও নির্ভীক বিচার ব্যবস্থা, নাগরিক স্বাধীনতা, আইনের শাসন তথা গণতন্ত্রের স্বার্থে অপরিহার্য বিবেচিত হয়। ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্যও নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ দরকার হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায়, বিচার বিভাগ কোন ধরণের রাজনৈতিক, শাসন বিভাগীয় এবং আইন বিভাগীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই ন্যায়বিচার সম্পন্ন করতে পারবে। বিচারকেরা আদালতে উত্থাপিত স্বাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন।

জেমস কেন্ট বলেন, "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় এ বিভাগের নিরপেক্ষতা ও অন্য বিভাগের প্রভাব মুক্ত থাকা।"

বিচারপতি আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন বলেন, "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হল সরকারের অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারের রায় ঘোষণা করা।"

হেনরি সিজউইক এর মতে, "সম্পূর্ণরূপে প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন থেকে ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে নিরপেক্ষতার নীতি অনুযায়ী বিচার কাজ সম্পন্ন করাকেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে।"

বস্তুত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা পরস্পরের পরিপূরক। সরকারের মান যাচাইয়ের অন্যতম পন্থা হল বিচার বিভাগের দক্ষতা ও স্বাধীনতার মূল্যায়ন করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য যে সকল পূর্বশর্ত রক্ষা করা প্রয়োজন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তার মধ্যে অন্যতম। কেননা, ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ, আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান, সংবিধানের ব্যাখ্যা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বিচার বিভাগ সম্পন্ন করে তাকে। এ প্রসঙ্গে লর্ড ব্রাইস বলেন, "সরকারের উৎকর্ষতা পরিমাপের জন্য বিচার ব্যবস্থার দক্ষতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন মাপকাঠি নেই।"

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা

রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা তথা সর্বজনের জন্য ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা ছাড়া ন্যায়বিচার আশা করা যায় না। আবার স্বাধীনতা ছাড়া বিচার বিভাগ নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারে না। বস্তুতপক্ষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা পরস্পরের পরিপূরক। বিচার বিভাগের উপর আইন বা শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব কার্যকর হলে পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার ক্ষুন্ন হতে বাধ্য।

তাই ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ বিচারের স্বার্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। বস্তুত: গণতন্ত্রের সাফল্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিরপেক্ষতা ও উৎকর্ষের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। রাষ্ট্রে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। আইনের শাসন, সংবিধান রক্ষা এবং বাক্ স্বাধীনতাসহ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব নয়। নিম্নে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় তুলে ধরা হল:

১। বিচারকদের যোগ্যতা: সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত বিচারপতি একান্তভাবে দরকার। দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে সৎ, সাহসী ও যথার্থ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিচারপতিদের পদে আসীন হলে, ন্যায় বিচারের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে প্রার্থীদের গুণগত যোগ্যতা সতর্কভাবে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। বিচারপতিগণ অবশ্যই বিজ্ঞ, স্বাধীনচেতা ও নিরপেক্ষ হবেন। কোন রকম রাজনৈতিক বিচারে বা দলীয় আনুগত্যের কারণে বিচারপতিদের নিয়োগ করা সমীচীন নয়। এমন নিয়োগ দেয়া হলে ন্যায় বিচারের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়।

২। বিচারক নিয়োগ: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিচারপতিদের সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে নিয়োগ করা যায়। (ক) জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন (খ) আইনসভা কর্তৃক মনোনয়ন এবং (গ) শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগ।

(ক) জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্য এবং সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি ক্যান্টনে প্রচলিত আছে।

(খ) আইনসভার দ্বারাও বিচারক নিয়োগ করা যায়। আইনসভার দ্বারা বিচারক নিয়োগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের এবং সুইজারল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে।

(গ) বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই শাসন বিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগের পদ্ধতিটি প্রচলিত আছে। শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারক নিয়োগের তৃতীয় পদ্ধতিটিই বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে কাম্য বিবেচিত হয়।

৩। বিচারকদের কার্যকাল: বিচারকদের কার্যকালের স্থায়িত্বের উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কার্যকালের স্থায়িত্ব না থাকলে নিষ্ঠার সাথে বিচারকার্য সম্পাদন করা বিচারকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এছাড়াও বিচারকের কার্যকাল স্বল্পস্থায়ী হলে পদের অপব্যবহারের আশঙ্কা থাকে। বিচারকদের কার্যকাল স্থায়ী হলে তাঁরা নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারকরা অক্ষম হয়ে না পড়লে ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত পদে বহাল থাকেন। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা ৬৫ বছর পর্যন্ত পদে আসীন থাকেন।

৪। বিচারকদের অপসারণ: বিচারকদের অপসারণ পদ্ধতির উপরও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভরশীল। নিয়ম লঙ্ঘন না করেও অপসারণের ভয় বা আশঙ্কা থাকলে বিচারকদের পক্ষে ন্যায়বিচার করা সম্ভব হয় না। তাই কোন বিচারককে যাতে সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া পদচ্যুত হতে না হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিচারপতিদের অপসারণ করার জন্য সাংবিধানিকভাবে বিশেষ বিধান থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক অভিশংসন প্রস্তাব (Impeachment motion) এবং সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশে একজন বিচারপতিকে অপসারণ করা যেতে পারে।

৫। বিচারকগণের বেতন ভাতা ও পদোন্নতি: বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে বিচারকদের বেতন ভাতারও সম্পর্ক আছে। স্বল্প বেতনভোগী বিচারপতিদের দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বিচারকপদে আকৃষ্ট করার জন্য বিচারপতিদের বেতন পর্যাপ্ত হওয়া দরকার। পর্যাপ্ত বেতন ও ভাতা না দিলে কোন অভিজ্ঞ আইনজীবী বা আইনজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি বিচারক হিসেবে কাজ করতে রাজি হবেন না। তাছাড়া তাঁদের বেতন ও ভাতা পদমর্যাদা রক্ষার উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও বিচারকগণ যাতে যোগ্যতার শর্তাদি পূরণের পরেও পদোন্নতি নিয়ে হতাশায় না ভোগেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬। বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য আইন ও শাসন বিভাগ থেকে তার স্বতন্ত্রীকরণ অপরিহার্য। প্রাচীনকালে রাজা বা রাজকর্মচারীরাই আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। আগে শাসনকার্য ও বিচারকার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না। এ ব্যবস্থা স্বৈরাচারের সুযোগ করে দেয়। হ্যারল্ড লাস্কির মতানুসারে শাসকের হাতে বিচারের ভার ন্যস্ত থাকলে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না। এ রকম ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ সহজেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশে বিচার বিভাগ ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ করা হয়।

৭। বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গিঃ বিচারপতিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণিচেতনার উপর বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিচারকদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতির ছাপ তাঁদের পেশাগত দায়িত্বের উপরে পড়তে পারে। এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিচারকরা কি ভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করবেন তার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। নির্দেশনা লঙ্ঘিত হলে কি ধরনের শাস্তি হবে তাও সুস্পষ্টভাবে অবহিত করতে হবে।

৮। জনগণ ও রাজনীতিবিদদের আগ্রহঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য জনগণ এবং রাজনীতিবিদদের আগ্রহ ও ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকতে হবে। সত্যিকার অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনবোধে জনগণকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চাপ প্রয়োগ ও আন্দোলন করতে হবে। এর জন্য বিভিন্নভাবে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

৯। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসঃ বিচারবিভাগের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখা এবং তা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব বিচারকগণেরই। বিচারকরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করলে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অটুট থাকলে ক্ষমতাসীন শাসকগণ বিচারকদের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহসী হবেন না।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করলে বিচার বিভাগকে স্বাধীন নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত রাখা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সুদৃঢ় অবস্থান ব্যতিরেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায়?

সার-সংক্ষেপ

বিচার বিভাগ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে। বিচারকদের দক্ষতা, যোগ্যতা, নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতার ওপরই বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা নির্ভরশীল। প্রকৃত অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হল কর্তব্য পালনে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকগণ যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সর্ব প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকবেন তখনই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় এ বিভাগের নিরপেক্ষতা ও অন্য বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকা।"– কথাটি কে বলেছেন?

ক) আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন খ) জেমন কেন্ট

গ) হেনরি সিজউইক ঘ) লর্ড ব্রাইস

২। 'সরকারের উৎকর্ষতা পরিমাপের জন্য বিচার ব্যবস্থার দক্ষতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন মাপকাঠি নেই।"– কার উক্তি?
ক) সিজউইক খ) আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন
গ) জেমস কেন্ট ঘ) লর্ড ব্রাইস

৩। বিচারকদের সাধারনত কয়টি পদ্ধতিতে নিয়োগ করা যায়?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

৪। কোন দেশের বিচারপতিরা আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন?
ক) ভারত খ) বাংলাদেশ
গ) বলিভিয়া ঘ) শ্রীলংকা

পাঠ-৯.১২ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Seperation of Power)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, জনগনের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, অধিকার, স্বেচ্ছাচারিতা।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ধারণা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল অর্থ সরকারের সমগ্র কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা এবং তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগের সহায়তায় তা পরিচালনা করা। বিভাগগুলো হচ্ছে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল কথা হচ্ছে সরকারের এ তিনটি বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হবে আলাদা ও স্বতন্ত্র। প্রত্যেক বিভাগ নিজ-নিজ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে। প্রত্যেকটি বিভাগের সংগঠনের প্রকৃতিও হবে স্বতন্ত্র। একটি বিভাগ অন্য কোন বিভাগের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। এ নীতি অনুযায়ী আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে। শাসন বিভাগ আইনগুলোকে বাস্তবায়ন করবে এবং বিচার বিভাগ বিচারিক কার্য সম্পাদন করবে ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করবে। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হল ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ধারণাটি বেশ পুরনো। বিভিন্ন সময়ে বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে ফরাসি চিন্তাবিদ জ্যাঁ বডিন বলেন, "আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তাঁরা কঠোর আইন প্রণয়ন করে তা নির্দয়ভাবে প্রয়োগ করবেন।" তাঁর কথায় একই সাথে বিচারক এবং আইন প্রণেতা হওয়ার অর্থ হচ্ছে ন্যায়বিচারের সাথে ক্ষমতার অধিকার এবং আইনের প্রতি আনুগত্যের সাথে স্বেচ্ছাচারিতার সংমিশ্রণ।"

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত চিন্তাবিদ জন লক এ প্রসঙ্গে বলেন, "একই ব্যক্তি আইন রচনা এবং তা প্রয়োগ করলে ব্যক্তি স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার এবং নাগরিকদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই তিনি অধিকার রক্ষার স্বার্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ অপরিহার্য বলে মনে করেন।

ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী চার্লস মন্টেস্কু তাঁর বিখ্যাত "The Spirit of Laws" গ্রন্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনিই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল প্রবক্তা। তিনি বলেন, "যখন একই ব্যক্তি বা একই শাসক বর্গের হাতে আইন রচনা এবং শাসন করার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় তখন জনগনের স্বাধীনতা থাকতে পারে না, অথবা আইন ও শাসন ক্ষমতা যদি বিচার বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র না হয় তাহলেও স্বাধীনতা থাকতে পারে না।"

মোট কথা সরকারের এ তিনটি বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে না পারলে স্বাধীনতা রক্ষিত হবে না। তিনটি ক্ষমতা আলাদা না থাকলে তা স্বৈরাশাসনের নামান্তর হবে। স্বাধীনভাবে কাজ করার নামে প্রত্যেকটি বিভাগ আলাদা-আলাদাভাবে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা ঠেকানোর জন্য যে নীতি প্রয়োগ করা হয় তার নাম 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য' (checks and balance) নীতি। এই নীতি অনুসারে সরকারের যে কোন একটি বিভাগের স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা ঠেকানোর জন্য অন্য বিভাগের হাতে কিছু আইনগত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কি বোঝেন?

সার-সংক্ষেপ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ধারণাটি পুরোনো। মন্টেস্কু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Spirit of Laws" গ্রন্থে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল অর্থ– সরকারের সমগ্র কাজকে তিনভাবে বিভক্ত করা। প্রতিটি বিভাগ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। এ নীতি অনুসারে, আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ আইনকে কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ উক্ত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করবে। কোন বিভাগ অন্য কোন বিভাগের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। প্রত্যেক বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা কে?
ক) জ্যাঁ বডিন খ) জন লক
গ) চালর্স মন্টেস্কু ঘ) টমাস হবস

২। 'The Spirit of Laws' গ্রন্থের লেখক কে?
ক) নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি খ) চালর্স মন্টেস্কু
গ) ই এম হোয়াইট ঘ) অ্যালান বল

৩। 'আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তারা কঠোর আইন প্রণয়ন করে তা নির্দয়ভাবে প্রয়োগ করবেন।" –উক্তিটি কার?
ক) জ্যাঁ বডিন খ) জন লক
গ) চালর্স মন্টেস্কু ঘ) এফ আই গ্লাউড

৪। মন্টেস্কু কোন দেশের অধিবাসী?
ক) ইতালি খ) জাপান
গ) স্পেন ঘ) ফ্রান্স

পাঠ-৯.১৩ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Separation of Power)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা বলতে পারবেন।
- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অসুবিধা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যক্তি অধিকার, ভারসাম্য নীতি, নাগরিক চেতনা, সংঘাত ও বিপ্লব, সংসদীয় ব্যবস্থা।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা

সরকারের তিনটি বিভাগ আলাদাভাবে কার্য সম্পাদন করলে সরকারি কাজে গতিশীলতা আসে। এছাড়াও এই নীতির প্রয়োগ হলে একজন বা কয়েকজন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারের ঝুঁকি কমে। নিম্নে ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা আলোচনা করা হল:

১। গতিশীলতা বৃদ্ধি: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এ নীতি বাস্তবায়ন হলে প্রতিটি বিভাগ আলাদাভাবে কাজ করবে। কাজের পরিধি জানা থাকলে কাজগুলো দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব। আর কোন বিভাগ যদি অন্য কোন বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করে সেক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

২। স্বেচ্ছাচারিতা রোধ: সরকারের তিনটি বিভাগের সকল ক্ষমতা যদি একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ প্রচন্ড ক্ষমতাশালী হয়ে যায়। জেরেমি বেন্থাম এ প্রসঙ্গে বলেন, "যখন আইন বিভাগ, শাসন বিভাগের সাথে সংযুক্ত হয়ে কাজ করবে তখন জনগণের স্বাধীনতা থাকবে না, কারণ তখন আইন বিভাগ এমনভাবে আইন প্রণয়ন করে শাসন করবে যা হবে স্বৈরাচারী"। সরকারের এহেন স্বৈরাচার বা স্বেচ্ছাচারিতা রোধে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির গুরুত্ব রয়েছে।

৩। ব্যক্তি অধিকার রক্ষা: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আরেকটি সুবিধা হল এর মাধ্যমে ব্যক্তি অধিকার রক্ষা পায়। কোন শাসক যদি নিজেই আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে থাকেন সেক্ষেত্রে নাগরিকের অধিকার খর্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কেননা সে শাসক নাগরিকের অধিকারের কথা না ভেবে নিজের ক্ষমতাকে কিভাবে আরো বেশি শক্তিশালী করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করেন। তাই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মাধ্যমে নাগরিক অধিকার রক্ষা পায়।

৪। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। আইন বিভাগ কিংবা শাসন বিভাগ যদি বিচার বিভাগের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করে তাহলে বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে আইনের শাসন (Rule of Law) বাধাগ্রস্থ হবে। তাই বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

৫। বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ফলে সরকারের তিনটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাদের কাজে দক্ষতা অর্জন করার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠে। কেননা এ সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন একই ধরনের কাজ করে থাকে। ফলে তাঁরা নিজ নিজ কাজে বিশেষজ্ঞ হয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায়, শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সুবিধা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তবে সরকারের কোন একটি বিভাগ যাতে অন্য দুই বিভাগ থেকে বেশি ক্ষমতাশালী না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অসুবিধা

গণতান্ত্রিক সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কার্যকারিতা অপরিহার্য হলেও এর আক্ষরিক বাস্তবায়ন সম্ভব ও কাঙ্খিত নয় বলেও অনেকে মনে করেন। ম্যাকাইভার বলেন, "মন্টেস্কু যে চরম ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কথা বলেছেন তা অসম্ভব।" নিম্নে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অসুবিধা আলোচনা করা হল:

১। সরকার অখন্ড ও অবিচ্ছেদ্য: সরকার একটি অখন্ড ও অবিচ্ছেদ্য সংগঠন, তাই একে সম্পূর্ণ আলাদা করা সম্ভব নয়। সরকারের তিনটি বিভাগ নানাবিধ বাস্তব কারণে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এই বিভাগগুলো একে অপর থেকে আলাদা হয়ে পড়লে সরকার পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বস্তত: অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ যদি পরিপূর্ণ রূপে কার্যকর করা হয় তাহলে সংবিধানই অকার্যকর হয়ে পড়বে।

২। শাসনযন্ত্রের অচলাবস্থা: ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ হলে এক বিভাগ অন্য কোন বিভাগের কাজে সহযোগিতা না করে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করার ঝুঁকি থাকে। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি এ প্রসঙ্গে বলেন, "সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র ও পৃথক করা হলে প্রতিটি বিভাগই তার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্য বিভাগের উপর চাপানোর চেষ্টা করবে।" এর ফলে শাসনযন্ত্রের অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

৩। রাষ্ট্র নিষ্প্রান: রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের মত একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। জে সি ব্লুন্টসলি তাই বলেন, "দেহ থেকে মস্তককে আলাদা করলে যেমন মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তেমনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করলে রাষ্ট্র নিষ্প্রান হয়ে পড়ে।" অর্থাৎ সরকারকে পুরোপুরি বিভাজন করলে সরকারের মূল বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর এর ফলে রাষ্ট্র নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে।

৪। অপূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ: পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই এখন পর্যন্ত ক্ষমতার পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ কার্যকর হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রবর্তিত হলেও, সেখানে এটি পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। সেখানে নিয়ন্ত্রন ও ভারসাম্যের নীতি প্রয়োগ হওয়ার ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব হয় নি।

৫। দায়িত্বশীলতা বিলুপ্ত: সরকারের তিন বিভাগ যদি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে এবং সর্বদা নিজেদের পরিধির মধ্যে অবস্থান করে, তাহলে তাদের দায়িত্বশীলতা বিলুপ্ত হবে, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা বিনষ্ট হবে। এর ফলে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

৬। শাসনকার্যের মান অবনত: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ফলে শাসনকার্যের মান কমে যেতে পারে। আইন বিভাগ যদি কেবল নিজেদের ইচ্ছামাফিক আইন প্রণয়ন করে, সেক্ষেত্রে শাসন বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস পায়। শাসন বিভাগের কাজ হল আইন বিভাগ থেকে প্রণীত আইন সমূহকে বাস্তবায়ন করা। শাসন বিভাগ যদি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখতে না পারে, সেক্ষেত্রে শাসন কার্যের মান অবনত হবে।

৭। সংসদীয় ব্যবস্থার অনুপযোগী: সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকারের আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজ করে। একজন মন্ত্রী যেমন শাসন বিভাগের সাথে সম্পর্কিত তেমনি আবার আইনসভার ও সদস্য। তাই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুপযোগী।

৮। অনৈক্যের সৃষ্টি: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে প্রত্যেক বিভাগ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন, "ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্যের সৃষ্টি হবে।"

পরিশেষে বলা যায়, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির নানাবিধ অসুবিধা থাকলেও, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য এই নীতির প্রয়োগ কাম্য, তবে স্বতন্ত্রীকরণের নামে যাতে নিয়ন্ত্রণহীন স্বেচ্ছাচারিতার নীতি প্রতিষ্ঠা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয় কেন?

সার-সংক্ষেপ

ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। আর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মাধ্যমেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা পায়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি চালু থাকলে, সরকারের একটি বিভাগের উপর আরেকটি বিভাগের হস্তক্ষেপের ঝুঁকি কমে যায়। তবে সরকারের কোন বিভাগ এককভাবে কাজ করলে সরকারের কাজের গতিশীলতা হ্রাস পায় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগটির স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা থাকে। বস্তুত: সারা বিশ্বের কোন রাষ্ট্রেই পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবায়ন করা যায় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ দ্বারা কোনটির স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব ?

ক) বিচার বিভাগ খ) প্রতিরক্ষা বিভাগ

গ) আইন বিভাগ ঘ) পররাষ্ট্র বিভাগ

২। "সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বতন্ত্র ও পৃথক করা হলে প্রতিটি বিভাগই তার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্য বিভাগের উপর চাপানোর চেষ্টা করবে।"– উক্তিটি কে করেছেন?

ক) টমাস হবস খ) জাঁ জাঁক রুশো

গ) হ্যারল্ড লাস্কি ঘ) জন লক

৩। মন্টেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি দ্বারা প্রভাবিত হন কোন দেশের সংবিধান প্রণেতারা?

ক) বাংলাদেশ খ) ভারত

গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) ফ্রান্স

পাঠ-৯.১৪ ক্ষমতা ভারসাম্য নীতি (Principles of Checks and Balances)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি পর্যালোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যক্তিস্বাধীনতা, ভেটো, সুপ্রীম কোর্ট, নিয়ন্ত্রণ।

ক্ষমতা ভারসাম্য নীতি

সরকারের সুষ্ঠু কার্যক্রমের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ অনস্বীকার্য। আবার এই নীতির আক্ষরিক অনুশীলন, সরকারের তিনটি বিভাগকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলার ঝুঁকি তৈরি করে। এই ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা সরকারের বিভাগগুলোর স্বৈরাচারী প্রবণতা রোধ, পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ এবং পারস্পরিক ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি প্রবর্তিত হয়। মার্কিন সংবিধানের বিভিন্ন অংশে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির উল্লেখ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি আলোচনা করা হল–

১। আইন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন সভা অর্থাৎ কংগ্রেসের কার্যাবলি উপর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির প্রয়োগ করা হয়েছে। সংবিধান মোতাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান কংগ্রেসের অধিবেশন আহবান করতে পারেন। আইন প্রণয়নের যাবতীয় ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান আইন প্রণয়নের অনুরোধ সম্বলিত বাণী কংগ্রেসে পাঠাতে পারেন। রাষ্ট্রপ্রধান এই বাণী কংগ্রেসকে আলোচনা করতে হয়। তবে কংগ্রেস রাষ্ট্রপ্রধানের বানীর বিষয়বস্তু প্রত্যাখান করতে পারে। আবার রাষ্ট্রপ্রধান স্বাক্ষর ছাড়া কংগ্রেস কর্তৃক পাস করা বিল আইনে পরিণত হয় না। কংগ্রেসে পাস হওয়া বিলকে 'ভেটো' প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপ্রধান আটকে দিতে পারেন। আবার কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করে দেখার ক্ষমতা আদালতের হাতে দেয়া আছে। বিচার্য আইনটি সংবিধান বিরোধী হলে আদালত অসাংবিধানিকতার দায়ে তা বাতিল করে দিতে পারে।

২। শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণঃ মার্কিন শাসন বিভাগের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের উপর ন্যস্ত আছে। রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু কংগ্রেস ও সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নন। রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যকাল চার বছর কিন্তু এই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অভিশংসনের মাধ্যমে পদচ্যুত করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ দরকার হয় কিন্তু কংগ্রেস অনুমোদন না করলে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ ব্যয়, কোন কর আরোপ বা বিলোপ করা যায় না। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে যাবতীয় ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতেই ন্যস্ত আছে।

৩। বিচার বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগও অন্য দুটি বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নয়। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্তি সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। আবার কংগ্রেস সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারে। তাছাড়া কংগ্রেস সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিষয়ক ক্ষমতা, জাতীয় আদালতসমূহের এখতিয়ার, বিভিন্ন অধঃস্তন জাতীয় আদালত গঠন ও বিলোপ প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা ভোগ করে। সর্বোপরি বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত রোধ এবং বিধি-নিষেধ আরোপের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যুগপৎ 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ' ও 'ক্ষমতা ভারসাম্যের' নীতিকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে। এর ফলে সরকারের তিনটি বিভাগের প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, আবার স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠা থেকে বিরত থাকে। এছাড়া এই দুই নীতির প্রয়োগের ফলে কোন বিভাগ এককভাবে প্রভাবশালী হওয়ার পরিবর্তে প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য বিরাজ করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে কি ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি'র প্রয়োগ রয়েছে?

সার-সংক্ষেপ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী সরকারের তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করা হলে সরকারের বিভাগগুলো স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। বাস্তবে এরূপ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। কেননা, সরকারের এক বিভাগের কাজের সাথে অন্য বিভাগের কাজের সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিদ্যমান। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থাকে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এরূপ ক্ষমতা ভারসাম্য নীতি কার্যকর রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি' কোন দেশে বিদ্যমান?

ক) যুক্তরাষ্ট্র খ) ব্রিটেন
গ) কানাডা ঘ) ইতালি

২। মার্কিন আইনসভার নাম কি?

ক) পার্লামেন্ট খ) কংগ্রেস
গ) লোকসভা ঘ) নেসেট

৩। কংগ্রেস প্রনীত বিলকে 'ভেটো' প্রয়োগ করতে পারে কে?

ক) স্পিকার খ) নির্বাচনী সংস্থা
গ) প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘ) রাষ্ট্রপ্রধান

পাঠ-৯.১৫ বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Seperation of Power in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সংবিধান, মন্ত্রিপরিষদ, সংসদীয় সরকার, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, জুডিশিয়াল কাউন্সিল।

বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রচলিত থাকায় এখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পুরোপুরিভাবে গৃহীত হয়নি। বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখ আছে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ শাসন কার্য পরিচালনা করবে এবং বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা ও বিচার কার্য পরিচালনা করবে। তবে এ বিভাগগুলোর মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এখানে আইনসভার সদস্যগণ মন্ত্রিসভা বা শাসন বিভাগেরও সদস্য। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান ও প্রকৃত নির্বাহী কর্তা। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীই প্রয়োগ করেন। আবার তিনি জাতীয় সংসদেরও নেতা। সংসদীয় ব্যবস্থাধীন অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশে বিচার বিভাগ ২০০৭ সালে পুর্নগঠিত হলেও তা এখনও পূর্নাঙ্গ স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি। কেননা, বাংলাদেশে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ এখনও কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়া রয়েছে প্রশাসনিক আইন, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল প্রভৃতি।

বাংলাদেশে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকেন। আইন বিভাগের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন। আবার বিচার বিভাগ আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে বাতিল করতে পারে না; কেবল সংবিধান বিরোধী বা অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে।

উপরোক্ত বাস্তবতায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি তাত্ত্বিক প্রয়োগ নেই। অবশ্য শুধু বাংলাদেশে নয়, সংসদীয় ব্যবস্থাধীন কোন দেশেই এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ মূল্যায়ন করুন।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান। সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় তাত্ত্বিক অর্থে বাংলাদেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর নয়। বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী, আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগ আইনকে কার্যকর করবে এবং বিচার বিভাগ বিচারিক কার্য সম্পাদন করবে। তবে এ বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশের আইনবিভাগ তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকে। শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। আবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ দান করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়?
ক) দশম খ) একাদশ
গ) দ্বাদশ ঘ) ত্রয়োদশ

২। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী কত সালে হয়েছিল?
ক) ১৯৯০ খ) ১৯৯১
গ) ১৯৯২ ঘ) ১৯৯৩

৩। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ কত সালে স্বাধীন হয়?
ক) ২০০৩ খ) ২০০৫
গ) ২০০৭ ঘ) ২০০৯

৪। বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিযুক্ত করেন কে?
ক) স্পীকার খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) মন্ত্রীসভা ঘ) রাষ্ট্রপ্রধান

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন

শামসুল করিম বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি বাংলাদেশের যে বিভাগে কাজ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই বিভাগই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

১। শামসুল করিম বাংলাদেশের কোন বিভাগে কাজ করেন?
ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) প্রতিরক্ষা বিভাগ

২। "ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি" বাস্তবায়িত হলে শামসুল করিম কি অর্জনে সক্ষম হবে?
ক) পূর্ণক্ষমতা খ) যথার্থ স্বাধীনতা
গ) অন্য বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ ঘ) ভারসাম্য রক্ষার অধিকার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন

ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি অনুযায়ী সরকারের প্রতিটি বিভাগ স্বাধীন হলেও, এদের প্রত্যেকে অন্যের স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিতে পারে। এর ফলে কোন বিভাগ অতিমাত্রায় ক্ষমতাশালী হতে পারে না।

৩। নিচের কোন দেশে এরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান–
ক) বাংলাদেশ খ) ভারত
গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘ) ব্রিটেন

৪। এ ব্যবস্থার ভিত্তি কি?
ক) আইনের শাসন খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
গ) নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য ঘ) শাসন বিভাগের প্রাধান্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫নং ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দিন

'ক' রাষ্ট্রে আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং সরকারের জবাবদিহিতা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। অপরদিকে 'খ' রাষ্ট্রের জনগণ এসব প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর 'খ' রাষ্ট্রে গণতন্ত্র চালু হলেও আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নেই।

৫। 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান?

ক) এককেন্দ্রিক খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়

গ) সংসদীয় ঘ) রাষ্ট্রপতি শাসিত

৬। উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' রাষ্ট্রে সরকারের যে বিভাগের বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা হল–

ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ

গ) বিচার বিভাগ ঘ) নির্বাচকমন্ডলী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭নং ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দিন

আজাদুল ইসলাম একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি দুই বছর পূর্বে একখন্ড জমি ক্রয় করেন। কিন্তু এলাকার কতিপয় প্রভাবশালীর কারণে তিনি জমি দখল নিতে পারছেন না। কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে আজাদুল ইসলাম আদালতের শরণাপন্ন হলেন।

৭। আজাদুল ইসলাম কোন আদালতের শরণাপন্ন হলেন?

ক) নিম্নস্তরের আদালত খ) মধ্যস্তরের আদালত

গ) উচ্চস্তরের আদালত ঘ) গ্রাম আদালত

৮। উক্ত আদালত যেসবের সমন্বয়ে গঠিত হয়–

i. ফৌজদারী আদালত ii. উচ্চ আদালত iii. দেওয়ানী আদালত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

'ক' রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান জনগনের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আইনসভার নিকট জবাবদিহি করেন না। তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী বরখাস্ত করার ক্ষমতা সংরক্ষন করেন।

(ক) সরকার কি?

(খ) বিচার বিভাগ বলতে কি বোঝায়?

(গ) 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) 'ক' রাষ্ট্রে বিদ্যমান সরকার পদ্ধতিকে আপনি কি উত্তম বলে মনে করেন? যুক্তি দেখান।

২। 'ক' রাষ্ট্র শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট তার কাজের জবাবদিহি করে এবং একটি কেন্দ্র থেকে সারা দেশ শাসিত হয়। এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগনের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে 'খ' রাষ্ট্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়া আছে। এর রাষ্ট্রপ্রধান জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

(ক) সরকারের অঙ্গ কয়টি ও কি কি?

(খ) আইনসভার দুটি কাজ লিখুন।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই দেশের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) 'ক' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা 'খ' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা থেকে উত্তম। বিশ্লেষণ করুন।

৩। ক ও খ পড়াশুনার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনে অবস্থান করছে। সেখানকার রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা তাদেরকে অভিভূত করে। ক এর দেশে সরকারের বিভাগগুলো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হলেও, খ এর দেশের প্রধান নির্বাহী আইন বিভাগ এমনকি বিচার বিভাগের উপরও প্রভাব বিস্তার করে।

(ক) বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি?
(খ) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলতে কী বুঝায়?
(গ) ক এর দেশে সরকারের বিভাগগুলো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হলেও কখনই জনস্বার্থের বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না- আলোচনা করুন।
(ঘ) 'খ' এর দেশের প্রধান নির্বাহী এরূপ ক্ষমতা চর্চা অগণতান্ত্রিক-মূল্যায়ন করুন।

৪। ডেভিড টেইলর 'ক' রাষ্ট্রের ও উইল স্মিথ 'খ' রাষ্ট্রে বসবাস করে। ডেভিডের রাষ্ট্রের সরকার জনগনের ভোটে নির্বাচিত হন। উক্ত রাষ্ট্রের সরকার প্রধান ও মন্ত্রীসভার সদস্যগণ আইনসভার নিকট জবাবদিহি করেন না। অপর দিকে উইলের রাষ্ট্রের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং সরকার প্রধান ও মন্ত্রীসভার সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

(ক) সরকার কাকে বলে?
(খ) শাসন বিভাগের দুটি কাজ লিখুন।
(গ) উদ্দীপকের আলোকে 'ক' রাষ্ট্রের সরকারের সাথে 'খ' রাষ্ট্রের সরকারের পার্থক্য উল্লেখ করুন।
(ঘ) ডেভিড ও উইলের দেশের দুটি সরকার ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের জন্য আপনি কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে করেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ ঃ ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৮ ঃ ১। খ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৯ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১০ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১১ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১২ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১৩ ঃ ১। ক ২। গ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১৫ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। গ ৫। গ ৬। খ ৭। ক ৮। খ